সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • এপ্রিল-জুন ২০২৩

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

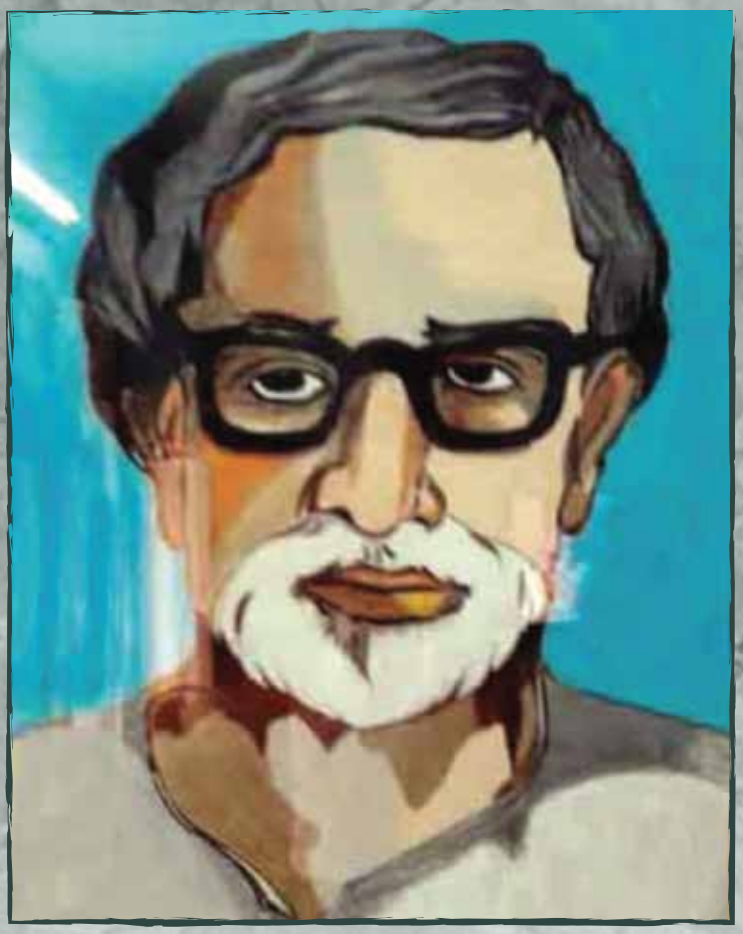

প্রচ্ছদ রচনা: ডা. লুৎফর রহমানের

জাতির উত্থান

বিশেষ আয়োজন

শান্তির সৈনিক আইনস্টাইন

প্রকৃতির পাঠশালা

চ্যাটজিপিটি

মুক্তপাঠাগার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদযাপন

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) ১৭ মার্চ ২০২৩এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার ও সভাকক্ষে আয়োজন করা হয় এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ এবং জাতীয় শিশুদিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করা হয়।

গণহত্যা দিবস ও স্বাধীনতা দিবস

সিদীপ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করেছে। ২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শাখাসমূহের সিদীপ কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত আলোচনাসভা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনাসভা আয়োজন করা হয়। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া ও নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা আলোচনাকালে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। জনাব ভুঁইয়া স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ১৯৭১ সালের এই দিনগুলোতে স্বাধীনতা অর্জনের নানা কর্মকাণ্ডে তার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনাপর্ব শেষে স্বাধীনতার ওপর কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

এপ্রিল - জুন ২০২৩ ● ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

জাতির উত্থান - ডা. লুৎফর রহমান	২
শান্তির সৈনিক আইনস্টাইন - আলমগীর খান	৫
প্রকৃতির পাঠশালা - শ্যামল দত্ত	৭
ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শাসক–মানুষ না যন্ত্র? - অলোক আচার্য	১০
এসএমএপি প্রকল্প	১১
শতবর্ষে ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয় - মো. গোলাম সরওয়ার	১২
উজান গণগ্রন্থাগারের জন্মকথা - আব্দুর রাকিব তালুকদার	১৪
মেঘালয় ভ্রমণ - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম	১৬
জেলেপাড়ায় উঠানস্কুলের শিক্ষিকা - তানজিনা আক্তার	২০
জীবনযুদ্ধে সফল এক কৃষক পরিবার - মো. ফয়সাল আহমেদ ও প্রতাপ চন্দ্র রায়	২১
তালের বিচিত্র খাবার - নাজমুন আমীন	২৩
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	২৪
মুক্তপাঠাগারে পুরস্কার বিতরণ ও অলোচনা	২৫
নতুন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার	২৬
শিক্ষালোক-এর পঞ্চম লেখক-শিল্পী সম্মিলন	২৭
পূরবী বসুর অনুসন্ধিৎসা - আশরাফ আহমেদ	২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

ডা. লুৎফর রহমান বিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলাদেশের তরুণ-যুব সমাজের মনে নৈতিক আদর্শের এক শক্ত ভিত তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। সেসময় বহু মানুষ তাঁর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী, সমাজকর্মী ও প্রগতিবাদী লেখক। বর্তমানে লুৎফর রহমানের রচনাসমূহের পাঠ অনেক কমে গেছে, অথচ এখনকার সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় তাঁকে পাঠ আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। তাঁর মানবকল্যাণমুখী গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে এবার 'জাতির উত্থান' লেখাটি শিক্ষালোকে পুনর্মুদ্রণ করছি।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত বিজ্ঞানি আলবার্ট আইনস্টাইন হয়তো বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ। তাঁর পদচারণা কেবল বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে ও এমনকি বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটেও তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধমুক্ত শান্তিবাদী পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য তিনি এক আপোশহীন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে স্বপন কুমার গায়েনের লেখা বইটিতে এই মহান মানুষটির জীবনের সেই শান্তিবাদী দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সে কারণে এ বই নিয়ে একটি আলোচনা আমাদের মনের জগতকে প্রসারিত করবে বলে মনে করি।

জীবনসংগ্রামে জয়ী এক কৃষক পরিবার, জেলেপাড়ায় সিদীপ উঠানস্কুলের শিক্ষিকা রিংকু দাস প্রমুখের কথা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক।

দেশে বইপড়াকে ছড়িয়ে দিতে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে'র নানাবিধ কার্যক্রম চলছে। তার কিছু প্রতিফলন আছে এ সংখ্যায়। আর একটি বড় উদ্যোগ–পাবনার কাশিনাথপুরে স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলনের আয়োজন। সিদীপের মুক্তপাঠাগার ও স্থানীয় 'প্রয়াস' পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে এ আয়োজন হতে যাচ্ছে, বইপড়া ও পাঠাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা খুবই আশা জাগানিয়া। এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

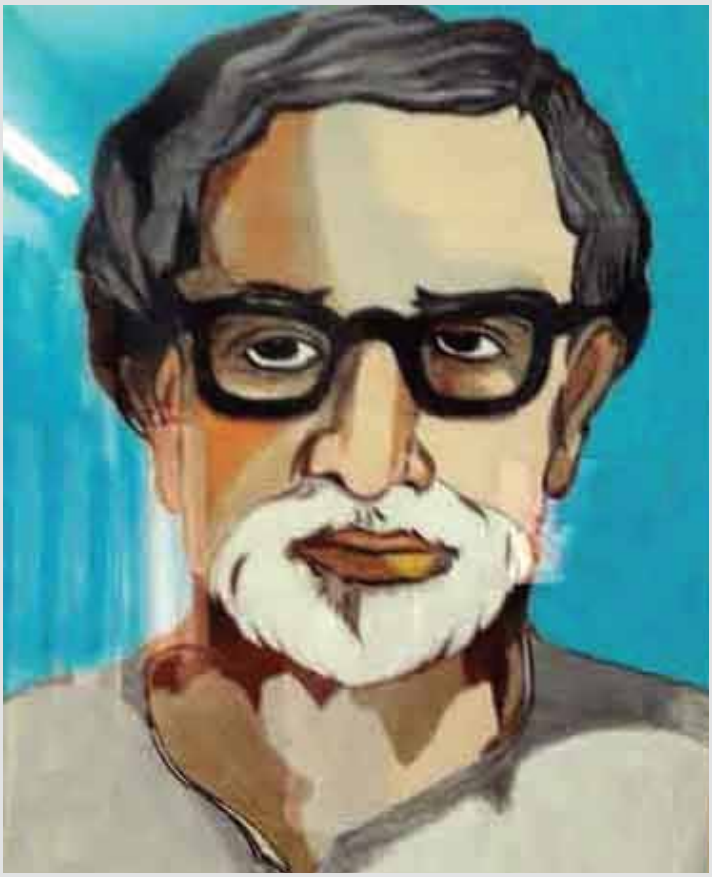

জাতির উত্থান

ডা. লুৎফর রহমান

উন্নত, ত্যাগী,
শক্তিশালী, প্রেমিক, সত্য
ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান
মানুষ বিদ্যাহীন বা
অল্পশিক্ষিত মানুষের
মধ্যে পাওয়া যায় না;
মানুষের বা জাতিকে বড়
হতে হলে সব সময়ই
তাকে জ্ঞানের সেবা
করতে হবে।

কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমরা বড় হও, তোমরা জাগ, তাতে ভাল কাজ হয় বলে মনে হয় না। এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি। পল্লীর অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত এক একটা মানুষের কথা ভাবতে হবে।

মানুষকে শক্তিশালী, বড় ও উন্নত করে তোলার উপায় কি? তাকে যদি শুধু বলি–তুমি জাগো–আর কিছু না, তাতে সে জাগবে না। এই উপদেশ বাণীর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত আছে। এইটে ভাল করে বোঝা চাই।

আবার বলি–কোন জাতিকে যদি বাহির হতে একটা লোক জাতীয় সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার টাকা তুরস্কে

পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন অগণ্য আর্ত মানুষের বেদনা কাহিনী গাইতে গাইতে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে পথে বের হতেন তখন প্রত্যেক মানুষের প্রাণ সহানুভূতি বেদনায় ও করুণায় ভরে উঠত। এই ব্যক্তি কিছুদিন পর তার এক নিরন্ন প্রতিবেশীর সর্বস্ব হরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মানুষের এই ভাবের জাগরণ ও বেদনা-বোধের বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয় না। কোন জাতির যখন পতন আরম্ভ হয়; তখন দেশসেবক যে কেউ থাকে না তা নয়। স্বাধীনতার মমতায় কেউ প্রাণ দেয় না, তা বলি না; যারা মন দেয়। তাদের মন ভিতরে ভিতরে অন্ধ হতে থাকে। জাতিকে খাঁটি রকমে বড় ও ত্যাগী করতে হলে সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বড় ও ত্যাগী করতে হবে কি উপায়ে? দেশের মানুষের ভিতর আত্মবোধ দেবার উপায় কি? প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী-উন্নত হৃদয়-প্রেম-ভাবাপন্ন-সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান, অন্যায় ও মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে কেমন করে? জাতির প্রত্যেক বা অধিকাংশ মানুষ এইভাবে উন্নত না হলে জাতি বড় হবে না।

প্রত্যেক মানুষের ভিতর জ্ঞানের জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জন্মিয়ে দেওয়া চাই। সংসার এমনভাবে চলেছে, যাতে সকলের পক্ষে বিদ্যালয় বা উচ্চ জ্ঞানের যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। অথবা সারা ছাত্রজীবন ধরে বিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভ করা হয়ে ওঠে না।

কেউ বাল্যে পিতৃহীন হয়, কারো পিতা জ্ঞানালোচনাকে বিশেষ আবশ্যক কাজ মনে না করে ছেলেকে স্কুলে পাঠান না, কেউ পাঠাভ্যাস কালে উদ্ধত ও দুর্মতি হয়ে পড়াশুনা ত্যাগ করে, কেউ বিদেশী ভাষার নিষ্পেষণে বোকা ভেবে পড়াশুনা বাদ দেয়। পাঁচ হাজার ছাত্রের মধ্যে পঞ্চাশজন ছাড়া বাকী সব ছেলেই সময়ে জ্ঞানান্ধ, হীন ও মৌন মূক হয়ে যায়। ইহা জাতির পক্ষে কত ক্ষতির কথা।

মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা। জীবনের সকল অবস্থায়–সকল সময়ে–আহার স্নানের মত মানুষের পক্ষে জ্ঞানের সেবা করা প্রয়োজন।

দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যক নাই। কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করবার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর। মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহিত্যে মানব সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না। দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করতে হবে, আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সার সংগ্রহ করতে হবে। নিজেদের যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

উন্নত, ত্যাগী, শক্তিশালী, প্রেমিক, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান মানুষ বিদ্যাহীন বা অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না; মানুষের বা জাতিকে বড় হতে হলে সব সময়ই তাকে জ্ঞানের সেবা করতে হবে।

দেশের সকল মানুষকে জ্ঞানী করে তোলার উপায় কি? জাতির জীবনের মেরুদণ্ড মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান। এই দুটি চাপা রেখে জাতিকে জাগতে বললে সে জাগবে না।

বুদ্ধির দোষে হোক বা অবস্থার চক্রে হোক, কোন দেশে যদি বহু মানুষ অশিক্ষা, অল্পশিক্ষিত বশতঃ অমার্জিতচিত্ত এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সে জাতির জীবন টেকসই হবে না। এই সব লক্ষ মৌন আত্মায় স্পন্দন আনবার এক উপায় আছে, কোটিবদ্ধ মুখে ভাষা তুলে দেবার এক পন্থা আছে। সকল দেশে সকল সময়ে সেই পন্থা কার্যকরী হয়ে থাকে। সেই পন্থা না থাকলে কোন জাতি বাঁচত না–উন্নত হওয়া স্বপ্ন অপেক্ষা অসম্ভব হতো।

জাতিকে শক্তিশালী করতে প্রত্যেক সময়ে মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করেছে। গ্রীক জাতি, রোমান জাতি, বর্তমান ইউরোপীয় জাতি–এই পথকে অবলম্বন করে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন।

যারা এই পথকে অবহেলা করে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে, তারা একটা অসম্ভব কাজ আরম্ভ করে।

এই পথ আর কিছু নয়–দেশের বা জাতির সাহিত্যের পুষ্টিসাধন। যে সমাজে সাহিত্যের কোন আদর নাই, তাহা সাধারণত বর্বর সমাজ। কথা কাগজে ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নাম সাহিত্য-সেবা। এই যে কথা, এ কথা সাধারণ কথা নয়–এই কথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেওয়া হয়, পুণ্যের বাণী ও মোক্ষের কথা প্রচার করা হয়, বর্তমান ও অন্তিম সুখের দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়।

এই কথার ধারা গান ও গল্প, কখনও কবিতা ও দর্শন, কখনও প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের রূপ

নিয়ে মানুষের সম্মুখে রঙীন হয়ে, মধুরভাবে দেখা দেয়।

দুর্গত কণ্টকাকীর্ণ আঁধার পথে কেউ যদি প্রদীপ না নিয়ে চলতে থাকে কিংবা আলোর যে আবশ্যকতা আছে, একথা উপহাসের সঙ্গে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কি বলা যায়? কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হতে চেষ্টা করলে সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না।

শিক্ষিতকে আরও শিক্ষিত, ভাবুককে আরও গভীর করবার জন্য, দেশের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শিক্ষাকেন্দ্রের বাহিরের লোকগুলিকে শক্তিশালী, জ্ঞানী ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন করবার জন্য প্রত্যেক দেশে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেন।

জাতির পথপ্রদর্শক তাঁরাই। তাঁরাই জাতি গঠন করেন। গ্রীস, আরব, হিন্দু ও ইউরোপীয় শক্তি সভ্যতার জন্মদাতা তাঁরাই।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এইসব শিক্ষিত শ্রেণী জাতিকে উর্ধ্বে টেনে তোলেন। ক্ষুধাতুর আর্ত তাদের স্পর্শে রাজা হয়ে ওঠে, পল্লীর কৃষক, দূর অজ্ঞাত-কুটিরের ভিখারী, জমিদারের ভৃত্য, দরিদ্র গো-যান-চালক, অন্ধকারের পাপী, বাজারের দরজী, নগরের ঘড়ি নির্মাতা, নবাবের ভৃত্য, গ্রাম্য উরুটে যুবক শ্রেণী তাঁদেরই মন্ত্রে মহাপুরুষ হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করবার উপযোগী তাদের কিছু শক্তি–অর্থাৎ কিছু বর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। এরাই জাতির মেরুদণ্ড–ছোট বলে এদিগকে অস্বীকার করলে জাতি প্রাণ-শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও কঠিন ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কার্য সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটা জাতির মানসিক ও পার্থিব পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংশোধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সঙ্কীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয়হিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে

দুর্গত কণ্টকাকীর্ণ আঁধার পথে কেউ যদি প্রদীপ না নিয়ে চলতে থাকে কিংবা আলোর যে আবশ্যকতা আছে, একথা উপহাসের সঙ্গে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কি বলা যায়? কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হতে চেষ্টা করলে সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না

শেখে। মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই সে ধর্ম মনে করে, আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর পুষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট শক্তি জেগে উঠে।

ইংরাজের বিরাট শক্তির অন্তরালে বহু লেখকের লেখনী শক্তি আছে। বস্তুত লেখক বা জগতের পণ্ডিতবৃন্দ নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে বিশ্বের সকল অনুষ্ঠান ও কামকেন্দ্রে গতি প্রদান করেন। তাদের অজানা হস্তের কার্যফলে অসংখ্য মানুষ মরুভূমে সাগর রচনা করেন, সাগরবক্ষে পাহাড় তোলেন–জগৎ সভ্যতার নির্মাতা তাঁরাই।

কোন দেশের মানুষ যদি এই লেখকশ্রেণীর বা দেশীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে তবে তারা বড় হীন। জাতির ভিতরকার সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর–সমস্ত জাতিটা শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করবার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের বইগুলি ধ্বংস কর, সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না।

দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যক নাই। কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করবার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর। মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহিত্যে মানব সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না। দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করতে হবে, আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সার সংগ্রহ করতে হবে। নিজেদের যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্যের শক্তিতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষ হতে পারে। মানুষের সকল বিপদের মীমাংসা সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে।

জাতি যখন দৃষ্টিসম্পন্ন ও জ্ঞানী হয়, তখন জাগবার জন্য সে কারো আহ্বানের অপেক্ষা করে না, কারণ, জাগরণই তার স্বভাব।

লেখক: ডা. লুৎফর রহমান, জন্ম মাগুরা জেলায় ১৮৮৯এ ও মৃত্যু ১৯৩৬এ। প্রখ্যাত যুক্তিবাদী লেখক, সম্পাদক ও সমাজকর্মী

শান্তির সৈনিক আইনস্টাইন

অস্ত্র নির্মূল, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে এক অনবদ্য সংগ্রাম

আলমগীর খান

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, তিনি নাকি বিজ্ঞানি না হলে একজন বেহালাবাদক হতেন। সঙ্গীতের জগতে এই মহান বিজ্ঞানির বিচরণ ছিল পানিতে মাছের সাঁতার কাটার মত। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সময়ে দুজনের কথপোকথনের একটি অংশ ছিল সঙ্গীতকে ঘিরে। একজন মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ এবং লোভলালসাহীন। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তাঁকে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অসম্মতি জানিয়েছেন। এর বাইরেও আরও একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে আলবার্ট আইনস্টাইনের। তা হচ্ছে সমকালীন বিশ্বে তিনি ছিলেন শান্তির অগ্রদূত। স্বপন কুমার গায়েনের লেখা 'শান্তির সৈনিক আইনস্টাইন' বইটি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ এ মানুষটির সেই পরিচয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন। বইটি এ বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করেছে অনুপম প্রকাশনী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ধ্রুব এষের।

মোট ১২টি অধ্যায়ে স্বপন কুমার গায়েন শান্তির সৈনিক হিসেবে শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি তুলে ধরেছেন। যে আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে আইনস্টাইন এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বা হতে বাধ্য হন তা লেখক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন ধারাবাহিকভাবে। এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের ঘনঘটা, সমঝোতার চেষ্টা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, যুদ্ধ প্রতিরোধ, নাৎসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পারমাণবিক বোমা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, কমিউনিজমের উত্থানের প্রক্ষোপটে স্নায়ুযুদ্ধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ।

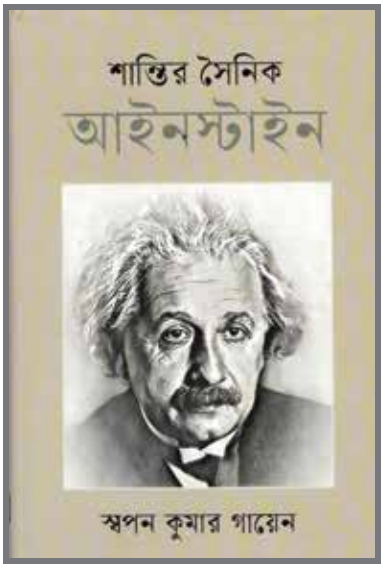

আর এসব ঘিরে তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানি, দার্শনিক, লেখক, সমাজবিজ্ঞানি, মনোবিজ্ঞানি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রমুখের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বশান্তির পক্ষে আইনস্টাইনের আপোশহীন লড়াই।

ভূমিকায় স্বপন কুমার গায়েন লিখেছেন, "জীবনের শেষ চার দশক ধরে তিনি বিজ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি যুদ্ধ প্রতিরোধ, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণের কাজে নিরন্তর সক্রিয় ছিলেন। বিজ্ঞান গবেষণা এবং শান্তি অন্বেষায় আইনস্টাইনের অবদান সম্পর্কে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'আইনস্টাইন তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে সেরা বিজ্ঞানিই শুধু ছিলেন না, তিনি একজন জ্ঞানী মানুষও ছিলেন, যা ভিন্ন কিছু। রাষ্ট্রনায়করা যদি তাঁর কথা শুনতেন, তবে মানব ইতিহাসের গতিপথ যা হয়েছে তার চেয়ে কম বিপর্যয়কর হতো।'"

আইনস্টাইনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, শান্তির সন্ধান, যুদ্ধবিরোধিতা, মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রাম, তাঁর বিশ্ব সরকার গঠনের প্রচেষ্টা ইত্যাদির চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে এ বইয়ে। আইনস্টাইনকে তিনি সকল দোষগুণের উর্ধ্বে একজন দেবতা বানানোর চেষ্টা করেননি; তাঁর সরলতা, ঐতিহাসিক ভ্রান্তি, দোদুল্যমানতা ও পথ পরিবর্তনের ছবিও তুলে ধরেছেন এতে। শান্তির অহিংস প্রবক্তা থেকে শান্তির একজন দৃঢ়চেতা সৈনিক হয়ে ওঠার পরিবর্তনটিও আইনস্টাইনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য মোড় পরিবর্তন যার রয়েছে বৈশ্বিক অভিঘাত যেটি এ বইয়ে নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গিতে উপস্থাপিত।

শান্তির জন্য অহিংসানীতির প্রবক্তা হিসেবে আইনস্টাইনের মনোভাব ১৯২৮এর ৪ জানুয়ারি দেয়া বিবৃতি থেকে পরিষ্কার: 'যুদ্ধের রীতিনীতি ও সীমা বেঁধে দেয়ার প্রচেষ্টা আমার কাছে একবারে নিরর্থক মনে হয়। যুদ্ধ খেলা নয়। নিয়ম মেনে খেলা চলে, কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শান্তির সময় জনসাধারণ যদি সামরিক চাকরি গ্রহণ পুরোপুরি অস্বীকার করার সংগঠন গড়েন, তবেই যুদ্ধ অনুষ্ঠানের কার্যকর বিরোধিতা করা সম্ভব হতে পারে।"

যে কোনো ধরনের সমরতন্ত্রের প্রতি ছিলো তাঁর তীব্র বিরোধিতা। ১৯৩১ সালে লেখা 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আই সি ইট' শীর্ষক লেখায় তিনি সমরতন্ত্রকে 'যুথবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট আগাছা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, "ব্যান্ডের তালেতালে দল বেঁধে মার্চ করে যারা আনন্দ পায় তাদের প্রতি আমি ঘৃণা বোধ করি। সভ্যতার শরীরে

এই লজ্জাজনক কলঙ্ক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুছে ফেলা উচিত। ... মানুষের সুস্থ কাণ্ডজ্ঞান যদি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে স্কুল আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে কলুষিত করা না হতো, তাহলে যুদ্ধের ভূত অনেক আগেই ছেড়ে যেত।"

সামরিক যেকোনো কিছুর প্রতি ছিলো তাঁর বিদ্বেষ। তিনি মনে করতেন যে, সমরতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ কখনো নির্মূল করা যাবে না। একদিকে মানুষ হত্যার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের নীতি আর অন্যদিকে যুদ্ধ বন্ধের আশা তাঁর কাছে দ্বিমুখী নীতিতুল্য। এ ব্যাপারে তিনি বহু সময় খুব স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন।

সবসময় যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে সঙ্গে রাখার প্রচেষ্টা তাঁর পরিচয়ে 'কমিউনিস্ট' তকমা লাগিয়ে দেয়। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের একটি সংগঠন তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বিরোধিতা করে। এ নিয়ে কৌতুককর মন্তব্য করেন আইনস্টাইন: "আগে কখনো আমি রমণীদের দ্বারা এমন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হইনি। ... যে ঝানু পুঁজিবাদীদের গিলে খেতে চায়, তার জন্য ঘরের দরজা খোলা রাখা কেন? সে আবার এত খারাপ যে একমাত্র নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো ধরনের যুদ্ধ করতে নারাজ।"

কিন্তু আইনস্টাইনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে যায় জার্মানিতে হিটলার ও তার নাৎসি বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর এবং ইউরোপে ফ্যাসিবাদ বিস্তারের কালে। ১৯৩৩ সালে লেখা এক চিঠিতে আইনস্টাইন বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি সামরিক চাকরি গ্রহণ করতে অসম্মত হব না।" সেই সময় প্রকাশিত এক কার্টুনে আইনস্টাইনকে দেখা যায় তলোয়ার হাতে। নিউ ইয়র্ক টাইমস শিরোনাম দেয়: "আইনস্টাইন শান্তিবাদী মতামত পরিবর্তন করেছেন, জার্মান ভীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহ করতে বেলজিয়ানদের পরামর্শ দিয়েছেন।"

এরপর ঘটে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৩৯ সালে আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লিখে পারমাণবিক বোমা তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, জার্মানিতে হিটলার আগেভাগেই পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলবে এবং ইউরোপিয়ান সভ্যতার জন্য তারা আরও বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। রুজভেল্ট এ চিঠির জন্য আইনস্টাইনকে ধন্যবাদ দেন এবং ১৯৪১এ পারমাণবিক গবেষণা খাতে বিরাট অনুদান নিশ্চিত করেন। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বোমা তৈরির লক্ষ্যে আমেরিকায় শুরু হয় ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোপনীয় কর্মকাণ্ড: ম্যানহাটান প্রজেক্ট।

এরই ফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মর্মান্তিক পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞ। এই অর্থহীন হত্যাযজ্ঞ আইনস্টাইনকে খুবই ব্যথিত করে। তিনি মনে করেন, মানববসতিহীন কোনো স্থানে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে শক্ত প্রতিরোধের বার্তা দেয়া যেত।

যদিও পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিলো না, তবু ১৯৪৬ সালে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদে আইনস্টাইন ও 'ই সমান এমসি স্কয়ার' সমীকরণসহ ব্যাঙের ছাতাকৃতির ছবি দিয়ে তাঁকে 'বোমার জনক' আখ্যা দেয়। মুহূর্তে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর পর তিনি স্বীকার করেন ও পরে বহুবার বলেন, "জীবনে আমি একটা বড় ভুল করেছি– প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে যখন আমি পারমাণবিক বোমা তৈরির সুপারিশ করি।"

স্বপন কুমার গায়েন লিখেছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনার ফলে "সফররত জাপানি পদার্থবিদ হিদেকি ইউকাওয়ার কাছে অশ্রুসজল চোখে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন। আর জীবনের পরবর্তী দশ বছর পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার সংগ্রাম করে গেছেন।"

যুদ্ধ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে ইংল্যান্ডের দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় তিনি অভিমত দেন: "বিজ্ঞান এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ... ছুরি মানুষের জীবনে অনেক কাজে আসে, আবার ছুরি দিয়ে মানুষ খুন করা যায়। ... যতদিন পর্যন্ত মানুষকে মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য সংগঠিতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া চলবে এবং তার ফলে যে মানসিকতা গড়ে উঠবে, তা বারবার শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।"

১৯৩১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ছাত্রদের লক্ষ করে বলেছিলেন, "মানুষের শ্রম এবং সম্পদ বিতরণকে কীভাবে সংঘটিত করলে আমাদের বিজ্ঞান চিন্তার ফসল মানুষের জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হবে, সেই বিশাল অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।"

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মানবসৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরেকটি পরিবর্তন আনে। তিনি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল আর বিশ্ব সরকার গঠনের অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবমুক্তির একমাত্র পথ জাতীয় সামরিক বাহিনীর বিলুপ্তি এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে গড়ে তোলা একটি গণতান্ত্রিক বিশ্বরাষ্ট্র।

স্বপন কুমার গায়েনের লেখা 'শান্তির সৈনিক আইনস্টাইন' বইটি মহান বিজ্ঞানি আইনস্টাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। আইনস্টাইনের দর্শন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ ইত্যাদির চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে এ বইয়ে যা আমাদের প্রকাশনা জগতকে করেছে আরও খানিকটা সমৃদ্ধ।

প্রকৃতির পাঠশালা

শ্যামল দত্ত

প্রকৃতির অপার ভাণ্ডার। প্রকৃতিকে জানার এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা এখনও মানুষের অজানা। প্রকৃতিকে দেখে জীবনে অনুশীলনেরও অনেক বিষয় আছে। যেমন সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আমরা কেমন উদাস হয়ে যাই। মনে হয় কুলকিনারাবিহীন অথৈ সাগরের মতো আমাদের জীবনও অনন্ত অসীম। জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ বা সময় দিয়ে একজন মানুষের জীবনের পরিধি মাপা যায় না। ইতালির জগদ্বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সেই কবে 'মোনালিসা'-র ছবি এঁকে রেখেছেন, অথচ আজও সেই ছবি নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। জার্মানির অমর সুরস্রষ্টা বিথোফেন আজও সর্বকালের সেরা সুরকার হিসেবে বিবেচিত হন।

ভোরের আলো ঘরের দরজায় এসে কেবল উঁকি দিয়েছে। বাইরে পাখিদের কিচির-মিচির। ঠিক এই সময়ে কি কারও বিছানায় শুয়ে থাকার ইচ্ছে হয়? একদম না। খোকা তাই চটপট বিছানায় উঠে বসে। চারদিক জুড়ে ভোরের আবছা আলোয় বিছানাটা বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কবে মায়ের সাথে এক বিছানায় শুয়েছে, সে কথা খোকার মনেই পড়ে না। মা সবসময় অসুস্থ থাকেন। তাই তাঁর ঘর, বিছানা সবকিছু আলাদা।

দূর থেকে হঠাৎ হারমোনিয়ামে কারও গলা সাধার আওয়াজ ভেসে আসে। ভারি মিষ্টি লাগে। বিশাল বড়ো কাঠের দরজা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খোকা। বাইরে রেলিং ঘেরা মস্ত বারান্দা। খোকা রোজ ঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির ইট-কাঠের চেয়ে বাইরের সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছগুলোকে বেশি আপন মনে হয়। একভাবে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে খোকা। হঠাৎ কী হলো, টুপ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো গাছের পাতার ওপর। হয়তো রাতের শিশির জমে ছিলো কোথাও। অথবা ভোররাতের বৃষ্টির জমে থাকা ফোঁটা। ফোঁটাটি পড়ার সাথে সাথে পাতাটি অমনি নড়ে ওঠে। আর ঠিক তখনই খোকার মুখ ফসকে বের হয় কথাটা: জল পড়ে, পাতা নড়ে। ...

এবার মনে পড়েছে এই খোকাটি কে, তার নাম কি? ডাক নাম 'রবি', পুরো নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির তখন বয়স মাত্র সাত বছর। সেই সাত বছর বয়সে প্রকৃতির কাছ থেকে শেখা চরম সত্য কথাটি গেঁথে দিলেন ছড়ার ছন্দে। সম্ভবত এটাই তাঁর জীবনের প্রথম রচনা। গাছের পাতার ওপর জল পড়লে পাতাটি যে নড়ে ওঠে, সে কথা সবাই জানে। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো করে এই সহজ সত্যটি কয়জন জেনেছেন? বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ঘটনাও অনেকটা এ রকম। আপেল বাগানে বসে নিউটন বিজ্ঞানের তত্ত্ব ভাবছেন। হঠাৎ গাছ থেকে টুপ করে একটা আপেল পড়লো মাটিতে। এভাবে আপেলবাগানে রোজ টুপটাপ কতো আপেল পড়ছে, কে তার খোঁজ রাখে। কিন্তু নিউটন বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বসে গেলেন। কেন আপেলটি মাটিতে পড়লো? সেটা মাটিতে না পড়ে আকাশের দিকে যেতে পারতো অথবা ভেসে থাকতো শূন্যে। স্যার আইজ্যাক নিউটনের এই ভাবনা থেকে সৃষ্টি হলো বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ 'মহাকর্ষ সূত্র'। সূত্রটির মূল কথা হলো, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গ্রিক গণিতবিদ আর্কিমিডিসের তরল পদার্থে কঠিন বস্তুর ভেসে থাকার সূত্র আবিষ্কারের ঘটনাটিও চমৎকার। গণিতবিদ আর্কিমিডিস একদিন গোসলের জন্য পানিভর্তি বাথটাবে নেমেছেন। সাথে সাথে বাথটাবের বেশ কিছুটা পানি উপচে বাইরে গড়িয়ে পড়ে। রোজ এমনই হয়। এটাই তো স্বাভাবিক। টইটুম্বুর চা-ভর্তি কোনো কাপে বিস্কুট ভিজিয়ে নিতে গেলে একটু চা তো বাইরে গড়িয়ে পড়বেই। কিন্তু আর্কিমিডিস অতো সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। আগে বিষয়টি খেয়াল না করলেও সেদিন খুব মনোযোগের সাথে ভাবতে শুরু করলেন। ব্যাস, বাথটাবে নেমে গোসলের কথা ভুলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মেতে উঠলেন আর্কিমিডিস। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন, সেটা পেয়েও গেলেন সাথে সাথে। ভেজা কাপড়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ইউরেকা'– মানে পেয়ে গেছি।

গণিতবিদ আর্কিমিডিসের সূত্রটা এ রকম যে, কোনো বস্তু তরল পদার্থে নিমজ্জিত হলে যে পরিমাণ তরল পদার্থ অপসারিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তিই বস্তুটিকে তরল পদার্থে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এক টুকরো লোহা পানিতে ডুবে যায়, কিন্তু লোহার তৈরি বৃহদায়তন জাহাজ ভাসে। কারণ লোহার টুকরো যে পরিমাণ পানি অপসারণ করে নিমজ্জিত হয়, সে তুলনায় তার নিজের ওজন বেশি। কিন্তু জাহাজ তার নিজের ওজনের তুলনায় বৃহৎ আয়তনের কারণে অনেক বেশি পরিমাণ পানি অপসারণ করে থাকে। তাই লোহার টুকরো পানিতে ডুবলেও লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে।

আসলে প্রকৃতির এই বিশাল আঙিনা থেকে মানুষ প্রতিদিন যে পাঠ পেয়ে থাকে, সেটাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আমরা যতোই নামকরা স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করি না কেন, মানবজীবনের আসল পাঠশালা প্রকৃতি। মানুষ সেই প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র। কবি সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কথা এখানে বলতেই হয়:

'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শেখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে'।

পৃথিবীবিখ্যাত অনেক মনীষীর ছেলেবেলা প্রকৃতির পাঠশালাতেই কেটেছে। কারণ তাঁদের অনেকের অভিভাবক অস্বচ্ছল ছিলেন। ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়ানোর সামর্থ্য অনেকেরই ছিলো না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করেছেন। ঘরে বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য ছিলো না তাঁর পরিবারের। বাবার হাত ধরে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মাইলপোস্ট দেখে তিনি ১, ২, ৩ গুণতে শিখেছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছেলেবেলাও কেটেছে নানা অভাব-অনটনের মধ্যে। দুঃখকষ্টের জীবন বলে ডাক নাম তাঁর 'দুখু মিয়া'। ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে স্কুলে যাবার তেমন সুযোগ হয়নি। ওই অতোটুকু বয়সে রুটির দোকানে কাজ করতে হয়েছে। লেটো গানের দলের সাথে ঘুরতে হয়েছে এখানে-সেখানে। কিন্তু পড়াশুনায় প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো তাঁর। নিজের চেষ্টায় বাংলা, আরবি, ফারসি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। চলার পথে যা দেখেছেন, সেখান থেকেই অর্জন করেছেন শিক্ষার পাঠ। আর এই পাঠ থেকেই জেনেছেন কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ। তাই নিজের চোখে দেখা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন:

'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?'...

তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ন্যায়-অন্যায়গুলো খুব কাছে থেকে দেখেছেন। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁর চোখে অর্থহীন মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন–

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়:
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি'॥ ...

সিদীপ উঠানস্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রকৃতিপাঠ

বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যতোটা সময় ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করেছেন, তারচে বেশি সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন সবুজ বন-বনানীর মাঝে। প্রকৃতির ভিতর এভাবে ঘুরতে-ঘুরতেই গাছের জীবন-রহস্য উদ্ভাবন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, গাছ চলাফেরা করতে বা কথা বলতে পারে না, কিন্তু তারও প্রাণ আছে। সাহিত্য বা বিজ্ঞান যেখানেই হাত বাড়াই, সেখানেই প্রকৃতি। অপার রহস্যে ঘেরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীর কাজ। শিল্পী এবং কবি বা সাহিত্যিকের কাজ সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা। পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা 'গড পার্টিকেল' বা 'ঈশ্বর কণা' নিয়ে এখন আলোচনা করছেন, সেই আলোচনার মূলেও প্রকৃতি। বিশ্বের যে কোনো সৃষ্টি আসলে বস্তু বা কণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্ব গড়ে উঠেছে অজস্র কণার সমষ্টিতে। এই বস্তু বা কণার ভর না থাকলে বৃক্ষ, পাহাড়, সমুদ্র, নদী এমনকী আমাদের এই সবুজ পৃথিবীর অস্তিত্ব কিছুই থাকতো না। বস্তুর ভরই যেন সবকিছুকে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছে। এই তত্ত্বকথাই 'ঈশ্বর কণা' নামে পরিচিত। স্কটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস্-এর সম্মানে একে 'হিগস্ কণা'-ও বলা হয়। কিন্তু ১৯২৪ সালে এ ধরনের কণার পরিসংখ্যান তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর বিকিরণ তত্ত্ব পড়াতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিলো, এর মধ্যে একটা ফাঁক আছে। কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। পরে তিনি নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন। আর সেই যুগান্তকারী পরিসংখ্যানটি কালক্রমে 'বোসন কণা' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য এখন 'হিগস্-বোসন কণা' নামেও এই তত্ত্বটি বিশ্বব্যাপী আলোচিত।

প্রকৃতির অপার ভাণ্ডার। প্রকৃতিকে জানার এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা এখনও মানুষের অজানা। প্রকৃতিকে দেখে জীবনে অনুশীলনেরও অনেক বিষয় আছে। যেমন সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আমরা কেমন উদাস হয়ে যাই। মনে হয় কুলকিনারাবিহীন অথৈ সাগরের মতো আমাদের জীবনও অনন্ত অসীম। জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ বা সময় দিয়ে একজন মানুষের জীবনের পরিধি মাপা যায়না। ইতালির জগদ্বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সেই কবে 'মোনালিসা'-র ছবি এঁকে রেখেছেন, অথচ আজও সেই ছবি নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। জার্মানির অমর সুরস্রষ্টা বিথোফেন আজও সর্বকালের সেরা সুরকার হিসেবে বিবেচিত হন।

এই যে শিল্পীর তুলিতে আঁকা রঙ অথবা পিয়ানো বা বাঁশির সুর, সেখানেও প্রকৃতির স্পর্শ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন শুধু পোড়া কাঠের কয়লা দিয়ে অনেক মূল্যবান ছবি এঁকেছেন। দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালা নামে তাঁর আঁকা এ ধরনের ছবিগুলো এখন জগদ্বিখ্যাত শিল্পের মর্যাদা পেয়ে থাকে। এ দেশের চলচ্চিত্রনির্মাতা হীরালাল সেনের নাম হয়তো আমরা ভুলেই গেছি। কিন্তু আজও এই উপমহাদেশে প্রথম চলচ্চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রোদের আলো-ছায়া দেখে মুগ্ধ কিশোর হীরালাল একদিন চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

রঙের কথা বলতে গেলে আমরা 'বেনীআসহকলা'-র কথা বলি। রংধনুর ৭টি রঙের এ রকমই নাম দিয়েছি আমরা। 'বে'-তে বেগুনি, 'নী'-তে নীল, 'আ'-তে আসমানি, 'স'-তে সবুজ, 'হ'-তে হলুদ, 'ক'-তে কমলা আর 'লা'-তে লাল। প্রকৃতির 'রংধনু'-র চেয়ে সেরা রঙ আর কোথাও আছে নাকি? একইভাবে ঝর্ণার ধারা, সাগরসৈকতে উপচে পড়া ঢেউ কিংবা ঝড়ো হাওয়া বা বাতাসের একটানা প্রবাহ সুরের উৎস। প্রকৃতি যে কতো ভাবে আমাদের শিক্ষিত করছে, তা বলে শেষ করার উপায় নেই। বাতাসের ভিতরে থেকেও আমরা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব টের পাই না, তেমনি বিশাল প্রকৃতির কোলে থেকে আমরা হয়তো বুঝতেই পারি না যে, প্রকৃতি অসীম!

ক্লাসের দুষ্টু ছেলেটা সবসময় দুষ্টুমি করে। পড়াশুনায় তার একটুও মন নেই। বুদ্ধি করে টিচার একদিন দেশের মানচিত্র আঁকা কাগজটি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ওর হাতে তুলে দিলেন। বললেন, ক্লাসে আজ তোমাকে কোনো পড়া বলতে হবে না, শুধু এই মানচিত্রটি ঠিকমতো জোড়া দিয়ে দাও। কাগজের টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ছেলেটা কী যেন ভাবলো। টুকরোগুলো উল্টেপাল্টে দেখেও নিলো একবার। তারপর ওর মুখে ফুটলো হাসি। কী আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যে ও মানচিত্রটি ঠিকঠাক জোড়া দিয়ে টিচারের সামনে এনে হাজির করলো। টিচার তো অবাক, মানচিত্র সম্পর্কে যে ছাত্রের কোনো ধারণাই নেই, সে এতো সহজে কাজটা করলো কীভাবে? প্রশ্ন করতেই ছেলেটা মাথা নিচু করে বললো, স্যার আমি তো মানচিত্র দেখে জোড়া লাগাইনি। কাগজের উল্টোপিঠে একটা গাছের ছবি ছিলো। ছেঁড়া টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে আমি কেবল সেই গাছটা তৈরি করেছি মাত্র, ব্যাস, অপরপিঠে মানচিত্র তখন অমনিই হয়ে গেলো।

আসলে প্রকৃতিকে মনে রাখা খুব সহজ। চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেই মনের চোখে আমরা আকাশ, মেঘ, সূর্য, তারা সব দেখতে পাই। আর তাই ছোটদের ছবি আঁকা শুরু হয় ফুল, পাখি, গাছ, লতা দিয়ে। প্রকৃতির সবখানেই আমাদের শেখার পাঠশালা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠদানের ব্যবস্থা করেছিলেন উন্মুক্ত আকাশের নিচে, গাছের শ্যামল ছায়ায়। কবি সুনির্মল বসুর ওই কবিতাটা বার বার মনে পড়ে:

'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানাভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতুহলে
সন্দেহ নাই মাত্র'।

শ্যামল দত্ত : লেখক, গবেষক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শাসক–মানুষ না যন্ত্র?

অলোক আচার্য

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচনায় রয়েছে চ্যাটজিপিটি। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বক্তব্য রয়েছে। চ্যাটজিপিটি নিয়েও রয়েছে সমালোচনা। ইতিমধ্যে নিষিদ্ধও হয়েছে। কিন্তু থেমে নেই। প্রথম পশ্চিমা দেশ হিসেবে ইতালি চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করেছে। দেশটির তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই প্রযুক্তিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ থাকায় সেটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চ্যাটজিপিটি একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক সার্চ টুল। একটা চ্যাটবট (Chatbot)। মাইক্রোসফটের সহযোগিতায় চ্যাটজিপিটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টার্টআপ ওপেনএআই। এই চ্যাটবট তৈরি করা হয়েছে জেনারেটিভ প্রিট্রেইনড ট্রান্সফরমার ৩এর উপর ভিত্তি করে। এটি একটি অত্যাধুনিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এআই মডেল। আগের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে এটি অনেক উন্নত। চ্যাটবটের হালনাগাদ ভার্সন জিপিটি-৪ এখন বাজারে এসেছে। অর্থাৎ এই চ্যাটবট ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। আবার চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী গুগুলের বার্ড চ্যাটবট বাজারে এনেছে। এখানেই শঙ্কা রয়েছে। যখন একটি প্রতিষ্ঠান কোনো প্রযুক্তি বাজারে আনবে এবং বাজারে সাড়া ফেলবে ঠিক সেসময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান তার থেকে উন্নত কোনো মডেল আনার চেষ্টা করবে এবং আনবে। এই যে কম্পিটউটার, মোবাইল ফোন, বিভিন্ন অ্যাপস, সফটওয়্যার ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রেই এমনটাই ঘটেছে। অর্থাৎ এসব উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। পেছনে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু যদি একই ঘটনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও ঘটে তাহলে তা শুধু ছাড়াতেই থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো যদি একসময় এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে না থাকে তখন কি ঘটবে? প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে থাকবে, না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হতে পারে? এই সম্ভাবনা কি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়? কারণ যেভাবে এর জনপ্রিয়তা, ব্যবহার এবং উত্থান ঘটছে তাতে ভবিষ্যতের কিছু শঙ্কা তো এসেই যায়। এই মডেল দ্বারা চ্যাটবট সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং যুক্তিযুক্তভাবে ফলাফল প্রদর্শন করে। যত সমালোচনাই আসুক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা থেমে নেই। এবং এর আধুনিক প্রযুক্তি এখন রীতিমতো বিস্ময় সৃষ্টি করছে। তবে সময় যতই এগিয়ে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধমত্তা নিয়ে শঙ্কাও জাগছে। বিশেষজ্ঞরা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত। সম্প্রতি জিওফ্রে হিন্টন টেক জায়ান্ট গুগল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত। এআই চ্যাটবটের বিপদ 'বেশ ভয়াবহ' বলেও সতর্ক করেছেন। এখন এই বেশ ভয়াবহ আসলে কতটা ভয়াবহ সে অবশ্য ভবিষ্যতই বলে দিতে পারে। তবে এটি যে মানুষের চিন্তাকে বাড়িয়ে দিয়েছে সে বিষয়টি নিশ্চিত। অনেকেই এখনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ বন্ধ করার পক্ষে! আবার কেউ কেউ এটিকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছেন। এর কারণও রয়েছে। সম্প্রতি জানা গেছে, বিজ্ঞানী, ডাক্তার ও গবেষকদের বানানো নতুন এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রায় নির্ভুলভাবে ক্যানসার শনাক্ত করতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে ক্যানসার রোগীর চিকিৎসায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হবে একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তবে গত এপ্রিল মাসে ওপেনএআইয়ের বানানো চ্যাটজিপিটির নতুন সংস্করণ জিপিটি-৪ উন্মোচিত হওয়ার পর টুইটারের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কসহ অনেক প্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব জিপিটি-৪এর চেয়ে শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে ৬ মাসের বিরতির আহবান জানানো এক চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। এখানে প্রশ্ন হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে তখন তুলনামূলক কম বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানব জাতির ভবিষ্যৎ কি হবে? কারণ এখন পর্যন্ত এই মহাবিশ্বের একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষই স্বীকৃত। মানুষ কি নিজের চেয়ে বুদ্ধিমান কাউকে (হোক যন্ত্র) পৃথিবীতে রাজত্ব করতে দিবে? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রশ্নটি মানব জাতির অস্তিত্বের।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট এখন সংবাদ পাঠ করছে, হাসপাতালে সেবা দিচ্ছে, চিকিৎসা করছে এবং লেখালেখিও করছে। অর্থাৎ মানুষ যা যা করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও সেটাই করছে। মানুষের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এমনকি চাকরির বাজার চলে যাচ্ছে রোবটের হাতে। আগে থেকেই মানুষের ধারণা ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হলে মানুষের চাকরির বাজার কমতে থাকবে। সম্প্রতি মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংকিং সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে বিশ্বের ৩০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মী চাকরি হারাবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্তরাষ্ট্রের ও ইউরোপের মোট কাজের এক-চতুর্থাংশ কাজ করে ফেলতে পারে। এর আগে বিবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এআইয়ের মাধ্যমে ছবি আঁকার কারণে নিজেদের কর্মসংস্থানের ক্ষতি হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বেশ কয়েকজন শিল্পী। মানুষের দেওয়া বুদ্ধিতেই মানুষকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এসব যন্ত্র। এখন চারদিকে যন্ত্রই সব। জোজি নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এক রোবট ১২০ ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। জোজি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে

মানুষের নির্দেশনা বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী কাজও করতে পারে। একটি যন্ত্রকে বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমত্তা প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করতে চাইছেন। একসময় হয়তো দেখা যাবে মানুষ ও রোবট পাশাপাশি হাঁটছে কিন্তু কোনটা মানুষ আর কোনটা রোবট আমরা বুঝতে পারবো না। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ শুধু এটুকু বলেই থেমে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটে। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের মতে, গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উন্নয়ন। তবে প্রতিযোগিতার বিষয়ে এখন অনেকেই তাদের অভিমত ব্যক্ত করছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে জানা যায়, প্রযুক্তি দুনিয়ার এক হাজারেরও বেশি মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, এআই সিস্টেম মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সমাজ ও মানব জাতির ওপর গভীর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শব্দটি ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি-র জন ম্যাকার্থী সর্বপ্রথম এই শব্দটির উল্লেখ করেন। তাকেই অধিকাংশের মতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জনক হিসেবে অভিহিত করেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রগুলো হলো মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, স্পিচ রিকগনিশন, রোবটিক্স, ভিশন এক্সপার্ট সিস্টেম। অবশ্য এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে আরেকজন রয়েছেন। তিনি হলেন অ্যালান টুরিং। বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের গবেষণা 'চার্চ-টুরিং থিসিস' থেকেই এটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি 'টুরিং পরীক্ষা' নামের একটি বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা উদ্ভাবন করেন। এই পরীক্ষাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি তৈরি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিয়ে রচিত সায়েন্স ফিকশনগুলো বেশ জনপ্রিয়। মানুষ বহু আগেই তার লেখায় রোবটকে বুদ্ধি দিয়ে গল্প লিখেছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক দাবি করেছেন, আগামী ১২০ বছরের মধ্যে মানুষ তাদের সব কাজ বুদ্ধিমান মেশিনের সাহায্যে করবে। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা যাই বলি, এটা তো মেশিন ছাড়া আর কিছু নয়। একটি মেশিন যদি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে এর ভালো এবং মন্দ দিকগুলো কি হবে? প্রযুক্তি আমাদের যেমন সুযোগ সুবিধা দিয়েছে ঠিক বিপরীতে আমাদের ক্ষতিও করেছে। প্রযুক্তি যেমন পৃথিবীর অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে। সেভাবেই প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহারের কারণে পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি। একইরকমভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো যন্ত্র যে ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য বিপদজনক হবে না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বিশেষত যখন প্রতিযোগিতা আসবে তখন আরও বেশি সমৃদ্ধ হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সেক্ষেত্রে কী ঘটবে তা ভবিষ্যতই বলে দিবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

এসএমএপি প্রকল্প

সিদীপ ২০১৫ সাল থেকে জাইকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়ন ও সহযোগিতায় SMAP প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। SMAP প্রকল্পের আওতায় সিদীপ প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রাণীসম্পদের উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে ও জামানতবিহীনভাবে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান করে থাকে। কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান করার জন্য সিদীপ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যেমন–সদস্যদের প্রকল্পের জীবচনচক্র অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদান, উঠান বৈঠক, স্টাফ ট্রেনিং, টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন, প্রদর্শনী প্লট তৈরি ও মাঠ দিবস, সমিতি বা মাঠ পর্যায়ে সরাসরি উপস্থিত থেকে কৃষকদের কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, হোয়াটস্অ্যাপ বা ইমোগ্রুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান ইত্যাদি।

উঠান বৈঠক কার্যক্রম

টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

কৃষকদের পরামর্শ প্রদান

শতবর্ষে ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয়

মো. গোলাম সরওয়ার

আজ থেকে একশত বছর পূর্বে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল কুসংস্কার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুশিক্ষা আমাদের বিবেকবোধ জাগ্রত করে তখনকার মানুষ তা জানতোই না। সমাজে দাদন ব্যবসার এতই মহামারী রূপ ছিলো যে সমাজপতিদের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ ছিল অসহায়। লেখাপড়া না জানায় তাদেরকে হতে হতো বঞ্চনার শিকার। ক্ষুধা-দরিদ্রতা ছিলো মানুষের নিত্যসঙ্গী। মানুষজন ছিল বৈষম্যের শিকার। ঠিক ওই সময়ে সমাজের বৈষম্য, কুসংস্কার ও অন্ধকার দূর করে সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেন যাদব চন্দ্র মজুমদার (যাদব বাবু)। তিনি উপলব্ধি করেন অন্তরাত্মাকে সমৃদ্ধ করে মানুষ রূপে বিকশিত করার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তারই ধারাবাহিকতায় যাদব বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯১৬ সালের তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের (বর্তমান কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত নাঙ্গলকোট উপজেলা হতে তিন কিলোমিটার পূর্ব দিকের গ্রাম ময়ূরা) হোমনা পরগনার বর্তমান ময়ূরা গ্রামে যাদব বাবুর উদ্যোগে একটি তেঁতুল গাছের নিচে টোল পদ্ধতির মাধ্যমে শুরু হয় এ অঞ্চলের মানুষদের শিক্ষা নামক যুদ্ধ। তেঁতুল গাছের নিচে স্কুলের কার্যক্রম শুরুর পর যাদব বাবু এলাকার মানুষদের বুঝিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্ঠি ভিক্ষা শুরু করেন। মাস শেষে ওই মুষ্ঠি ভিক্ষার অর্থ দিয়ে টোল শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাইনর স্কুলে পরিণত করেন তিনি। এক পর্যায়ে ছেলের এমন উদ্যোগ দেখে যাদব চন্দ্র মজুমদারের পিতা রামচন্দ্র মজুমদার ১৯১৬ সালের ১৯ মে প্রায় ২ একর ১২ শতক সম্পত্তি স্কুলের নামে দান করেন। এর পরই শুরু হয় মাইনর স্কুলের কার্যক্রম। ওই সময়ের মাইনর স্কুল ছিল দু'টি ভাগে বিভক্ত (লোয়ার প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি)। লোয়ার প্রাইমারিতে ৫টি শ্রেণি আর আপার প্রাইমারিতে ২টি শ্রেণির মাধ্যমে এলাকার অশিক্ষিতদের লেখাপড়া করানো হতো। স্কুলের ঘরগুলো ছিল মাটির। ১৯২২ সালে মাইনর স্কুলটি জুনিয়র স্কুলে (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) রূপ নেয়। ১৯৩০ সালে ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় ।

দক্ষিণ কুমিল্লা দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, তৃষ্ণা (চৌদ্দগ্রামের চিওড়া) ও হোমনা (নাঙ্গলকোট উপজেলা) দুই অঞ্চলে দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আশপাশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা দূর-দূরান্ত হতে এসে ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। আশপাশের ষাটোর্ধ্ব

শিক্ষিত মানুষজনের নিকট ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সময়কালের স্মৃতিচারণ এখনো আমাদের মুগ্ধ করে।

শতবর্ষে সুদীর্ঘ পথচলার মাঝে ময়ূরা অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং কালের সাক্ষী। শৈশব ও কৈশোরে চঞ্চল মনের হাজারো স্বপ্ন ও কতশত স্মৃতি লুকানো আছে মনের গহীনে। স্কুলটির পশ্চিমে দেয়াল ঘেঁষে ছিল চাঁপা ফুলের গাছ। সহপাঠীদের সাথে চাঁপা গাছের এ ডাল হতে ও ডালে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতিগুলো এখনো নিজেকে যেন শৈশবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। স্কুল আঙ্গিনায় ছিল বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ। সবুজ প্রকৃতি ঘেরা বিদ্যালয়টিতে রয়েছে একটি বিশাল খেলার মাঠ, তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবন ও একতলা বিশিষ্ট ৩টি ভবন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখে চলছে বিদ্যালয়টি। বর্তমানেও এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ধারাবহিকতা অব্যাহত রয়েছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করে দেশের নামিদামি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে। কতশত ছাত্রছাত্রী আসা যাওয়ার মাঝেও সগৌরবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যালয়টি। প্রবল বাধা উপেক্ষা ও সংগ্রাম করে শত বছরের পথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়টি আজ এই এলাকাকে আলোকিত করে তুলেছে। ময়ূরা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে জানা অজানা অনেকেই দেশ এবং জাতিকে আলোকিত করেছেন।

শতবছরের প্রাচীন এ স্কুলে পড়াশুনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এ বিদ্যালয়ের কারণে আমাদের এলাকার বেশিরভাগ মানুষ এখন শিক্ষিত। এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখে চলছে বিদ্যালয়টি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বিদ্যালয়টি এগিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: সাবেক শিক্ষার্থী, ১৯৯৮ ব্যাচ, বর্তমানে সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, রায়পুর-গৌরিপুর শাখা, কুমিল্লা

মহাকাশ

ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা

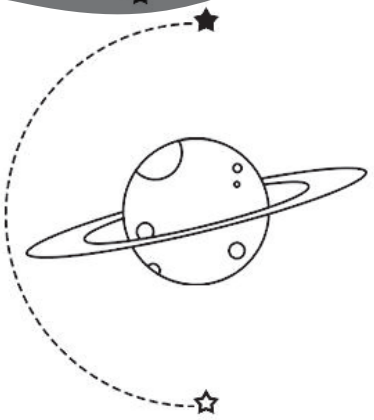

কোন আকাশে বাড়ি তোমার
কোন মহাশূন্যের গায়
কেমনে যাবো তোমার আকাশে
পাড়ি দিয়ে কোন নায়।
আমার পৃথিবী ছোট্ট জায়গা
দুই শ' আটাশ দেশ
তের লক্ষ গুণ তোমার পৃথিবী
আহা কি পরিবেশ।

তারকাপুঞ্জি জুইস ব্যাটেল
সূর্যের চেয়ে বড়
সুপারনোভা ব্ল্যাক হোল
প্রক্সিমা আলফা জড়।
প্রথম পৃথিবীর মহাশূন্য
দ্বিতীয় পৃথিবীর আকাশ
তৃতীয় পৃথিবীর মহাশূন্য
চতুর্থ পৃথিবীর আকাশ।

তুমি যাবে আমার সাথে
নক্ষত্র তারার দেশে
তের লক্ষ বছর সময় লাগবে
মহাশূন্যের আকাশ যেতে।
পঞ্চম পৃথিবীর মহাশূন্য
ষষ্ঠ পৃথিবীর আকাশ
সপ্তম পৃথিবীর মহাশূন্য
তারপর সাত আসমান।

ঐ সব গ্রহে থাকে কারা
দেখতে তারা কেমন
দেখতে নাকি খর্বাকার
নাম শুনেছি বামন।
সাত আসমানে আছে আমার
বিশাল সমুদ্রজগৎ
আরশের কুরশি আল্লাহর আরশ
বিশাল সিংহাসন।

দোহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উজান গণগ্রন্থাগারের জন্মকথা

আব্দুর রাকিব তালুকদার

পদ্মা নদীর কোল ঘেঁষে সবুজ তরুরাজি বেষ্টিত এক সাংস্কৃতিক জনপদের নাম দোহার। আনুমানিক ২০০ বছর পূর্বেই এই জনপদে মানুষের বসতি স্থাপনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। ঢাকা জেলার সর্বদক্ষিণে এবং নবাবগঞ্জ থানার ঠিক পশ্চিমে দোহার থানার অবস্থান। দোহারের উত্তরে নবাবগঞ্জ, দক্ষিণে পদ্মানদী, পশ্চিমে হরিরামপুর ও পূর্বে শ্রীনগর থানা অবস্থিত। দোহার ও নবাবগঞ্জ এই দুই থানা মিলে গঠিত হয়েছে ঢাকা-১ আসন। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টির সাথে ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সমাজতাত্ত্বিক যোগসূত্র থাকে। বাংলাদেশের মধ্য দক্ষিণ-পশ্চিমের মানিকগঞ্জ হতে দোহার হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত অঞ্চলকে লোক সাহিত্যে ভাটিয়ালি অঞ্চলের পূর্বভাগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পদ্মা নদী আর ঘন সবুজের বেষ্টনি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মন খুলে গান গাওয়া, অন্যের গানে তাল মিলিয়ে গানের দোহারি ধরার প্রবণতা। লোক মুখে শোনা যায়, গানের দোহারি নাম থেকেই দোহার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সুর, নদী আর প্রকৃতি মিলে এখানে অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজ করে। দোহারে অনেক কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত সাম্যবাদের কবি ও সাহিত্যিক কবি মহিউদ্দিন, লোককবি দুখাই খন্দকার, জারি গানের কবি ও শিল্পী তসর আলী, অকাল প্রয়াত কবি মিজানুর রহমান শমসেরি, বাউল গানের শিল্পী পরশ আলী দেওয়ান, লোকসংগীত শিল্পী, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক হাসান মতিউর রহমান, অভিনেতা জামিলুর রহমান শাখা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গাজী রাকায়েত, শিক্ষানুরাগী ও সমাজমনস্ক ব্যক্তিত্ব জি.এস চৌধুরী, ক্যাপ্টেন নুরুল হকসহ আরো অনেক গুণিজন। এই দোহারের মাটিতেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আরেক বিখ্যাত লোকগানের কবি, সুরকার ও শিল্পী কুটি মনসুর। অনেক গুণিজনের পদচারণাও ছিল এই ভাটির দেশে। কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীনসহ আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির দোহারে পদচারণা ছিল। উপমহাদেশের ভূরাজনৈতিক বিষয়েও দোহারের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। উপমহাদেশের ("অসহযোগ" ও "ভারত ছাড়") আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর কয়েকবার দোহারে আগমন এবং মালিকান্দায় (বর্তমান গান্ধী আশ্রমে) দুইদিন অবস্থান করায় তার প্রমাণ মেলে। মহাত্মা গান্ধী গান্ধীসেবা সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে ১৯৪০ সালে দোহারে আগমন করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে মুক্তিযুদ্ধের যে রূপরেখা আঁকা হয়েছিল, সেখানে দোহারের অবস্থান ছিল দুই (২) নং সেক্টরে। সেক্টর কমান্ডার (প্রথমে) মেজর খালেদ মোশাররফ ও (পরে) মেজর এটিএম হায়দার এবং সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের অনেক যুবক ভাই সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক সময় দোহারের তাঁত শিল্পের সুনাম ছিল দেশ-বিদেশে। এখনো জয়পাড়ার তাঁতের লুঙ্গি দেশজুড়ে সমাদৃত। এছাড়াও মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্পেও দোহার প্রসিদ্ধ ছিল। দোহার অঞ্চলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এখানকার মানুষ গান পছন্দ করে। দোহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে যুগ যুগ ধরে ভাটিয়ালি, পালা, কবি, বাউল, মারফতি ইত্যাদি গান মিশে আছে। মারফতি গান, মেলা, বাঁশনাচসহ ফকির বাড়িগুলোতে থাকে নানা আয়োজন। শত শত সাধারণ মানুষ এবং ভক্তবৃন্দ এসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নুরুল্লাপুর সানাল ফকির বাড়ি, বাস্তা ফকির বাড়ি, কাঠাখালী চৌধুরী বাড়ি ইত্যাদি এইধরনের লোক উৎসবের জন্য পরিচিত। দোহার উপজেলায় (সরকারি হিসেব অনুযায়ী) বর্তমানে ৮৫টি স্কুল, ৪টি কলেজ, ১টি

কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজ, ২টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং ৩৩টি মাদ্রাসা রয়েছে। অনেকগুলো স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলেও অত্র অঞ্চলে গণগ্রন্থাগার বা জনসাধারণের জন্য পাঠাগারের ইতিহাস খুব বেশি সমৃদ্ধ ছিল না । তবে পাড়া মহল্লায় ক্লাবভিত্তিক পাঠাগার ও ব্যক্তিগত বৈঠকখানায় অনেক পাঠাগারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- অকাল প্রয়াত সংগঠক ও সমাজসেবক কুদ্দুস কমিশনারের উদ্যোগে ব্যাঙ্গার চকে একটি পাঠাগার, আবুল কাইয়ুমের সেতু স্মৃতি পাঠাগার, দোহার বাজারে আমাদের পাঠাগার, মধুরচরে আলতাব হোসেনের উদ্যোগে আফতাব কথা বিতান, মইতপাড়া পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের জন্য পাঠাগার বলতে মূলত উপজেলা ভবনের ভেতরে একটি রুম পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তবে বর্তমানে সেটা সচল নেই। অনেক দেরিতে হলেও কিছু চিন্তাশীল মানুষ এই জনপদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে বেগবান করার লক্ষ্যে একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছে। এই অঞ্চলের শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই এলাকার জন্মগ্রহণকারী অনেক মানুষ দেশে-বিদেশে কীর্তিমান হয়ে দোহারের গৌরব বৃদ্ধি করে আসছে। একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনেক আগে থেকেই জনমনে বিচ্ছিন্নভাবে ঘনীভূত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে জাতিতে বা অঞ্চলে যত পূর্বে সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, তাদের গণগ্রন্থাগারগুলোও তত বেশি সমৃদ্ধ। একটি সমৃদ্ধ গণগ্রন্থাগার একটি সমাজেরও রূপরেখা বদলে দিতে পারে। গণগ্রন্থাগার চিন্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্রস্থল। দোহার উপজেলার সাধারণ মানুষকে আলোকিত করতে ও সমাজের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণার্থে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপন এখন সময়ের ন্যায্য দাবি। স্থানীয় প্রশাসন, সমাজের কোমল মনের দাতাগোষ্ঠী আর একদল যুবকের নিরলস প্রচেষ্টায় উজান গণগ্রন্থাগার স্থাপনের শুভ সূচনা হলো। উজান গণগ্রন্থাগার এখন সর্বসাধারণের জ্ঞান অন্বেষণ ও চিত্তবিনোদনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। সপ্তাহে তিন দিন (শুক্র, শনি এবং মঙ্গল) দুপুর ৩.০০ ঘটিকা থেকে রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকে। যে কেউ এখানে এসে বই, সাময়িকী, পত্রিকা ইত্যাদি পড়তে পারেন। পাঠক সদস্য হওয়ার পরে যে কেউ বই ধার নিয়ে বাসায় পড়তে পারেন। আবার কোন কারণে গ্রন্থাগারে আসা সম্ভব না হলে, বই বাসাতে পৌঁছে দেয়া হয়। আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, উজান গণগ্রন্থাগার দোহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি মুক্ত চর্চাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। উজান গণগ্রন্থাগার নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত নির্বিশেষে, দর্শন ও মতবাদিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাবে। শুধু উজান নয়, আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন দোহারের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই গ্রন্থাগারগুলোকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে বেড়ে উঠবে নতুন প্রজন্ম। গ্রন্থাগারগুলোতে থাকবে বিশ্বের সেরা বইগুলো। প্রিয় বইগুলো না পাওয়ার আক্ষেপ ঘুচে যাবে চিরতরে। বই নিয়ে তর্ক করবে শিশু কিশোরেরা। আনন্দ করবে, পুলকিত হবে তারা। একে অপরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে মূল্য দেয়া শিখবে। প্রেমিকা তার প্রেমিককে ফুল নয় বই উপহার দিবে। পাঠাগারকে ঘিরে তৈরি হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব । জ্ঞান এবং আনন্দের পরতে পরতে শেকড় ছড়িয়ে তার রস নিয়ে বেড়ে উঠবে দোহারের নতুন প্রজন্ম। আলোকিত মানুষে মুখরিত হবে সমাজ, শ্রেণী-বর্ণের পার্থক্য ভুলে এখানকার শিশু কিশোরেরা সহনশীল ও সহমর্মী হয়ে উঠবে । আমরা আমাদের মনের মাঝে এমন স্বপ্নই লালন করি। আমাদের এই স্বপ্নের সাথে একাত্মতা ঘোষণা সমীচীন মনে করলে আসুন সকলে মিলে একসাথে কাজ করি। নতুন এক পরিশীলিত দোহার গঠনে নিজেকে নিয়োজিত করি। পড়ি বই আলোকিত হই–এই স্লোগান নিয়ে উজান গণগ্রন্থাগারের সকল কর্মসূচিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করি। জ্ঞানের আলোয় সুষমাময় নতুন দোহার গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা করি। উজান গণগ্রন্থাগার হয়ে উঠুক জ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দোহার গঠনে নিরন্তর বাতিঘর।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, উজান গণগ্রন্থাগার।

মেঘালয় ভ্রমণ

মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

ডাউকি ব্রীজ

গল্পের শুরুটা আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগের। সাল ১৯৯৭, অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া ১৩-১৪ বছরের কিশোর আমি। বন্ধুদের সাথে স্টাডি ট্যুরে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা জাফলংয়ে। যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে রাস্তার অদূরের উঁচু সবুজ পাহাড়গুলো মুগ্ধতা ছড়াচ্ছিলো। যখনই জানতে পারি সে পাহাড়গুলো আমাদের দেশে না, মনে যে কী ভীষণ আক্ষেপ তৈরী হলো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না! সে আক্ষেপ কয়েকগুণ বাড়লো যখন তার পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। জাফলংয়ের পাথুরে নদীর স্বচ্ছ জল যতোটা মন কাড়লো তারচে ঢের বেশি আকর্ষণ করলো পাশের দৈত্যাকৃতির পাথুরে পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় গ্রাম, উমগট নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু। দুই পাহাড়ের মাঝে এতোবড় ঝুলন্ত সেতু কিশোর মনে এক অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। নদীর স্বচ্ছ পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে ইচ্ছা করছিল অদৃশ্য কাঁটাতার ডিঙ্গিয়ে সেই পাহাড় ছুঁয়ে আসি। বিস্ময়কর সেই সেতুর উপর উঠে নদীর স্বচ্ছ জলে লাফিয়ে পড়ার তুমুল বাসনা মনে দোলা দিলো। দুই বন্ধু মিলে সাঁতরে কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলাম, তখনই উপর থেকে বিএসএফের জওয়ানদের বন্দুক তাক করা কড়া হঁশিয়ারিতে সম্বিত ফিরে পেলাম। আর সাহস করে উঠতে পারিনি। পাহাড়ের উপরে চকচকে দা হাতে পাহাড়িদের দেখে আরও বেশি ভয় পেলাম। মনে মনে ভয় পেলেও মনের গহীন কোণে এক প্রবল ইচ্ছা জাগলো সেই পাহাড় ছুঁয়ে দেখার, সেই মানুষগুলোকে জানার।

দীর্ঘ অপেক্ষা ঘুচিয়ে অবশেষে পহেলা মে ২০২৩ দুই বন্ধু জনি ও ফয়সালকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দিলাম মেঘের বাড়ি মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে। ইন্ডিয়ার ভিসা আগেই করা ছিল কিন্তু এন্ট্রি রুট হিসাবে ডাউকি স্থলবন্দর ছিল না, ফলে মাত্র ৩০০ টাকা ফি দিয়ে এক্সট্রা এন্ট্রি রুটের জন্য আবেদন করতে হয়। যথারীতি আবেদন করে পেয়ে যাই কাঙ্ক্ষিত অনুমতি। চার দিন তিন রাতের ট্রিপ প্ল্যান করে যাত্রা শুরু করি পহেলা মে বিকাল ৫টায় । ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে চড়ে বসি সিলেটগামী কালনী এক্সপ্রেসে। উদ্দেশ্য সিলেটে স্কুল বন্ধু সজীবের বাসা। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকাল ৭:৩০ টায় রওয়ানা দেই। ২রা মে, সিলেট শহরের সোবহানি ঘাট থেকে মাত্র ১৫০ টাকা করে গেটলক সার্ভিস বাসে ১ ঘন্টায় তামাবিল চেকপোস্টে পৌঁছে যাই। চাইলে কেউ সিএনজিতেও যেতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে ভাড়া পড়বে ১০০০-১২০০ টাকা। যারা স্বল্প খরচে ট্যুর করতে চান তাদের জন্য বাস সার্ভিসটাই উত্তম। যাদের সিলেটে স্কুল বন্ধু সজীব নাই তারা ঢাকা থেকে রাতের বাসে সরাসরিও তামাবিল চেকপোস্টে যেতে পারেন। বাস থেকে নেমেই পাশের সোনালি ব্যাংকে ট্রাভেল ট্যাক্স জমা দিয়ে সোজা চেকপোস্ট, সেখানে প্রথমে ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে যাই এবং প্রয়োজনীয় ফর্মালিটিস শেষ করে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নিয়ে তারপর বিজিবি'র কাছে রেজিস্টারে এন্ট্রি হয়ে গেলে স্বাক্ষর করে চলে গেলাম ভারতের চেকপোস্টে। সেখানেও কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ঢুকে গেলাম মেঘের বাড়ি মেঘালয় রাজ্যে ।

চেকপোস্ট থেকে ১ কি:মি: ভিতরে ডাউকি বাজার, আমরা এই পথটা হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সেখানে দাম দর করে ট্যাক্সি

লিভিং রুট ব্রিজ

নেয়ার সুযোগ থাকে যা চেকপোস্টে থাকে না। কয়েকজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে কথা বলে আমরা পেয়ে যাই একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও আন্তরিক ট্যাক্সি ড্রাইভার। নাম দেমেকিট পোরা ল্যাম্বা, সে দেমেকিট নামে পরিচিত। যাওয়ার পথে চারটি (ওমক্রেম ফলস, বরহিল ফলস, মাওলিন্নং ভিলেজ, ও লিভিং রুট ব্রিজ) দর্শনীয় জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার শর্তে ৩০০০ রুপি ভাড়ায় তার সাথে মৌখিক চুক্তি শেষে শুরু হয় মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়িটি মোড় ঘুরতেই দৃশ্যমান হলো ছোট্টবেলার সেই স্বপ্নের ঝুলন্ত সেতু ডাউকি ব্রিজ। দুটি বিশালাকৃতির পাহাড়ের প্রায় চূড়ায় দুটি পাহাড়কে যুক্ত করে কি নির্বিকার ভঙ্গিতে ঝুলে আছে! যতোই আগাচ্ছি অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হচ্ছিলাম। দূর থেকে সবাই যে সেতুর ছবি তুলে মনের খেদ সংবরণ করে সেই সেতু বিজয় করে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সেতুর মুখে ঝুলানো ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞার সাইনবোর্ড দমাতে পারেনি। ট্যাক্সিটি সেতুর উপর একটু জ্যামে পড়তেই ড্রাইভারকে বলে টুপ করে নেমে পড়লাম নিজের দেশকে পিছনে রেখে একটা সেল্ফি তুলতে। ছবি তুলতে যাব তখনই আবার বিএসএফের জওয়ানের কড়া হুঁশিয়ারি কানে ভেসে এলো। যেভাবে দ্রুত নেমেছিলাম সেভাবেই দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়লাম। ছবি তুলে মনেমনে যেন বিশ্বজয়ের আনন্দ। ব্রিজ থেকে নেমে বামে মোড় নিতেই নিচের উমগট নদীর সবুজ ও নীলাভ রঙের স্বচ্ছ জল মন কেড়ে নিলো। স্বচ্ছ জলে ভাসমান ছোট নৌকাগুলো দেখে মনে হচ্ছিলো যেন শূণ্যে ভাসছে। অদূরেই বাংলাদেশের জাফলংয়ে পর্যটকদের দেখতে পাচ্ছিলাম, একদিন ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে এই সুবিশাল পাহাড়ে আসার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেসব ভাবতে ভাবতেই দৃষ্টিসীমা থেকে ঝাপসা হয়ে এলো প্রিয় বাংলাদেশ।

বিশাল পাহাড়ের গা ঘেসে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে আমাদের নিয়ে দেমেকিটের ট্যাক্সি এগিয়ে চলছে। একপাশে উঁচু পাহাড় অন্যপাশে কয়েকশত ফুট গভীর পাহাড়ের ঢালে সহস্র সুপারি গাছের বাগান, মাইলের পর মাইল জুড়ে এতো সুপারি গাছ কোথাও দেখিনি। জনমানবহীন রাস্তায় মাঝেমাঝে পিঠে ঝুড়ি ও হাতে চকচকে দা নিয়ে দুয়েকজন খাসিয়া ছেলেদের দেখা মেলে। দেমেকিটের সাথে কথা বলে জানতে পারি তারা সুপারি পাড়ার কাজ করে। এটাই তাদের অন্যতম পেশা। মনে পড়ে গেলো ছোট বেলায় চকচকে দা হাতে সেই পাহাড়িদের কথা। মুহূর্তেই যেন রহস্যের জট খুলে গেলো। হাতে চকচকে দা দেখে যাদের ভয়ংকর মনে হয়েছিল তারা আদতে খুবই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। নিজের বোকামি বুঝতে পেরে মনের অজান্তেই ঠোঁটের কোনায় হাসির রেখা দেখা দিলো।

রাস্তার পাশেই ওমক্রেম ফলস। দেমেকিট ট্যাক্সিটাকে একপাশে রেখে ছোট একটা ঝর্ণা দেখিয়ে আমাদের বললো এটা ওমক্রেম ফলস। একনজর দেখেই আশাহত হলাম। যাওয়ার আগে এতো বিশাল বিশাল ঝর্ণার খোঁজ নিয়ে গেলাম আর সামনে এ কী দেখছি! মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিলাম সামনে হয়তো ভাল কিছু থাকবে। অল্প কয়েকটা ছবি তুলে এবং দেমেকিটকে দিয়ে নিজেদের কিছু গ্রুপ ছবি তুলে রওয়ানা দিলাম পরবর্তী গন্তব্য বড়হিল ফলস। নামের মতোই বিশাল দৈত্যাকৃতির পাথুরে ঝর্ণাটি। বর্ষাকাল না হওয়ায় পানির প্রবাহ অনেকটাই কম হলেও দেখে এর বিশালতা আন্দাজ করা যায়। বর্ষায় পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হলে প্রথম দর্শনেই যে কারও প্রেম আদায় করার মতো রুপ তার আছে।প্রথম দর্শনেই মুগ্ধতা না ছড়ালেও বড়হিল ঝর্ণার বিশালতা কল্পনা করে কিঞ্চিৎ মুগ্ধতা নিয়েই এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিন্নংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রায় ১ ঘন্টা ড্রাইভ করে গাড়ি যখন মাওলিন্নংয়ের কাছাকাছি তখনই তার পরিচ্ছন্নতা আঁচ করা যাচ্ছিল। কোন উৎসবের আগে বা বাড়িতে বিশেষ কোন মেহমান আসার খবরে আমরা যেরকম নিজের বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন করি সেরকম একটা ব্যাপার যেন প্রস্ফুটিত গ্রামের প্রতিটি রাস্তায়, বাড়িতে ও আনাচেকানাচে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে সুশোভিত ফুলের বাগানে নাম না জানা কতোরকমের ফুল ফুটে আছে। কোথাও কোন আবর্জনার স্তুপ নেই, নেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চকলেট কিংবা চিপসের প্যাকেট। দেশ বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি যেন থাকে তাদের প্রতিদিন। সবাই যার যার বাড়ি, তার আশপাশের রাস্তা নিজেরাই পরিচ্ছন্ন রাখে। সেখানেই একটি রেস্তরায় দুপুরের খাবার শেষে পুরো গ্রামটি ঘুরে দেখলাম। গ্রামটির মতোই পরিচ্ছন্ন গ্রামের মানুষের মন। সুন্দর একটি খেলার মাঠ, আকর্ষণীয় গির্জাকে পাশ কাটিয়ে গ্রামের যতো ভিতরের দিকে গেলাম তাদের পরিচ্ছন্নতায় ততোই মুগ্ধ হলাম। হঠাৎ পাশ থেকে এক ভাইয়ের কথা শুনে চমকে উঠলাম। স্পষ্ট বাংলায় তিনি তার বন্ধুকে বলছেন এখানে দেখার মতো সুন্দর কিছুই পেলাম না! খুব আফসোস হলো বিদেশ ঘুরতে আসা ভাইটির জন্য। তিনি এই পরিচ্ছন্নতার মাঝে কোন সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন না! যদি সৌন্দর্য খুঁজে পেতেন তাহলে হয়তো ফিরে গিয়ে নিজের গ্রাম নিয়ে না হোক অন্তত নিজের বাড়ির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভাবতে পারতেন। মন ভরে গ্রামটিকে দেখে ফিরে আসার সময় আচ্ছন্নের মতো নিজের দেশে এমন একটি এলাকার স্বপ্ন বুনছিলাম।

ওয়েসে ডং ফলস

লাইটলুম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন

এবার লিভিংরুট ব্রিজে যাওয়ার পালা। দুটি পাথুরে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরির উপর সুবিশাল দুটি গাছের (রবার-ডুমুর) নরম শিকড় দুইপাশ থেকে জড়িয়ে দিয়ে সেখানকার অধিবাসীরা ব্রিজের আকৃতি দেন, পরবর্তীতে শিকড়গুলো পরিপক্ক হয়ে যাতায়াতের উপযুক্ত হয়। মেঘালয়ের পূর্বখাসি পাহাড় ও জৈন্তা পাহাড়ের খাসিয়া মানুষেরা প্রকৃতি ও মানবসভ্যতাকে কী এক অপূর্ব বন্ধনের জালে জড়িয়ে দিয়েছে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ৭২টি গ্রামে প্রায় ১০০টির মতো লিভিংরুট ব্রিজ রয়েছে। ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৯ মার্চ ২০২২ প্রাকৃতিক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন সেতুগুলিকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক স্থাপত্যশৈলী মন ভরে উপভোগ করে এবং ঝিরির ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মুখে ছিটিয়ে মনে এক অনাবিল শীতলতা নিয়ে শিলংয়ের পথে ছুটে চললাম।

ট্যাক্সি যখন শিলংয়ের পথে ছুটে চললো দেমেকিটের সাথে পরের দিনের ভ্রমণ পরিকল্পনা করে ফেললাম। ভিনদেশে এই দেমেকিটই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ৫টি পূর্ব নির্ধারিত স্পট ঘুরে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের এলাকা চেরাপুঞ্জি যাওয়া এবং সেখানে রাত কাটিয়ে পরেরদিন আরও ৫টি স্পট ভিজিট করা এবং চেরাপুঞ্জিতে মোট ২ রাত কাটিয়ে ফেরার পথে শ্লোংপেডাং দেখে দেশে ফেরা। ভাঙ্গাচুরা ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দির সংমিশ্রণে দেমেকিট আমাদের শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথে মোট ১০ টি দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে চেরাপুঞ্জি পৌঁছে দেয়ার কথা বললো যার মধ্যে ৯টিই আমাদের পরিকল্পিত তালিকায় ছিল। তার প্রস্তাবে মনে মনে খুশিই হলাম। সে প্রথমে ৪০০০ রুপি চাইলেও দরদাম করার পর ৩৩০০ রুপিতে সে রাজি হয়ে যায়। তার সাথে গল্প করতে করতে এবং বিকালের মিষ্টি আলোয় নয়নাভিরাম পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমরা পৌঁছে যাই শিলংয়ের পুলিশ বাজারে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে পরদিন সকাল ৭টায় সময় ঠিক করে দেমেকিট চলে যায়। সেখানে রেইনবো হোটেলে ২১০০ রুপিতে তিনজনের জন্য একটি ডাবল রুম বুক করে কিছুটা ফ্রেশ হয়ে টুকটাক কেনাকাটা করার জন্য দ্রুত বের হলাম। সেখানে আবার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য ৮:৩০ টার মধ্যে মার্কেট বন্ধ করার নিয়ম এবং তারা নিয়মের ব্যাপারে বেশ শ্রদ্ধাশীল।

সকাল ৭ টায় সময় দেয়া থাকলেও ট্যাক্সি আসতে প্রায় ৮টা বেজে গেলো। রওয়ানা দিয়ে প্রথমে গেলাম শিলংভিউ পয়েন্ট, যা আসলে এলিফ্যান্ট ফলস যাওয়ার পথেই পড়ে। এটা তেমন কোন দর্শনীয় জায়গা না হলেও পাহাড়ের চূড়া থেকে একনজরে সম্পূর্ণ শিলং শহরটিকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। রাস্তার দুপাশে বিশাল ঝাউয়ের সারি অতিক্রম করে যখন আমরা এলিফ্যান্ট ফলস পৌঁছলাম তখন ৯টা বাজে। একই জায়গায় তিনটি ঝর্ণা থাকলেও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে তারা যেন রুপ হারিয়েছে। ঝর্ণাতে এতো কম পানি দেখে তৃষিত মনের তৃষ্ণা নিবারণ হয়নি বলা যায়। ঝর্ণার ভরা মৌসুম আসলে বর্ষায়। জুলাই-সেপ্টেম্বর এই সময়টাই ঝর্ণা দেখতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। অসময়ে ঝর্ণা দেখতে গেলে এমন হতাশ হওয়ার বিকল্প নাই। যদি আপনার কল্পনাশক্তি ভালো হয় তবে ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে ভরা মৌসুমের ঝর্ণাকে কল্পনা করেও আমার মতো তৃপ্তি পেতে পারেন। সেখান থেকে বের হয়ে আমাদের গন্তব্য লাইটলুম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন। পাহাড়ে বেশ কয়েকবার যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও এবারের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। সেখানকার যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য চোখে দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। লাইটলুম অর্থ হলো পাহাড়ের শেষ। সেখানে গিয়ে মনে হয়েছে আলোর শুরুটা বোধ হয় এখানেই। শিলংয়ের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টে বসে এক কাপ ধোঁয়া উঠা চা খেতে খেতে মেঘ ও আলোর নাচন দেহ মনকে শীতল করেছে। অপার্থিব কোন জগতে প্রবেশ করার অনুভূতি হয়েছে। মনে হচ্ছিলো শুধু এই একটা জায়গা দেখার জন্য হলেও বারবার মেঘালয়ে আসা যাবে। বলে রাখা ভালো লাইটলুমের আসল সৌন্দর্য দেখতে হলে অবশ্যই দুপুরের আগে যেতে হবে।

প্রুটফলসে যাওয়ার পুরো সময়টা আমি লাইটলুমেই আচ্ছন্ন ছিলাম।প্রুটফলসের কাছাকাছি এক জায়গায় গাড়ি পার্ক করে বেশ কিছুদূর হেঁটে যেতে হয়েছে। যতো কাছে যাচ্ছি পানির একটা গর্জন কানে ভেসে আসছে। মনে মনে বেশ খুশি হলাম টগবগে একটা ঝর্ণা দেখতে পাওয়ার আভাস পেয়ে। এবার আর হতাশ হতে হয়নি। চোখের সামনে সুউচ্চ এক পাথুরে পাহাড় থেকে ঝড়ে পড়ছে টলটলে স্বচ্ছ পানি। সবুজাভ পানি দেখে বিমোহিত হলাম। বিশাল পাথরখণ্ড ডিঙিয়ে চলে গেলাম সবুজাভ পানির কাছে। মনভরে তা উপভোগ করলাম। কবি ঝর্ণাকে পাহাড়ের কান্না বললেও আমার কাছে মনে হয়েছে এ কান্না হতে পারে না। রুক্ষ পাথুরে জনপদেও মানুষের জন্য সুপেয় পানি দানের আনন্দে

যেন পাহাড় উদ্বেলিত। এ কোনভাবেই কান্নার জল নয়, এ যেন আনন্দের ফোয়ারা বইছে। কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটলাম ওয়েসে ডং ফলসের উদ্দেশ্যে। পুরো ভ্রমণের সবচেয়ে কঠিন যাত্রা ছিল এটি। গাড়ি থেকে নেমে ওয়েসে ডংয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড়িরা সিঁড়ি বানিয়ে রাস্তা করে রেখেছে। নামার মুখেই কয়েকজন ফিরে আসা পর্যটকের ক্লান্ত চেহারা দেখে হার্টে রিং পড়া বন্ধু জনি নামার সাহস করলো না। আমরা দুজন তাকে বসিয়ে রেখে আল্লাহর নাম নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম। ঠিক কয়শত সিঁড়ি নেমেছি না গুনলেও শরীর সইতে পারছিল না। অনেকটা পথ নামার পর দৃষ্টিগোচর হলো কাঙ্ক্ষিত ওয়েসে ডং ফলস, তাও অনেক উপর থেকে। তিনটি ধাপে বিভক্ত এই ঝর্ণাটির নীল ও সবুজাভ পানির সৌন্দর্য মুগ্ধ করার মতো। সামনেই যে সৌন্দর্য দেখছি বর্ষাকালের কল্পনা করার প্রয়োজন পড়ে নি। সিঁড়ি বেয়ে আর নিচে নামার সাহস করিনি। দূর থেকেই ভালো কিছু ছবি তুলে ফিরে এসেছি।

ডাইন্থেলেন ফলসটি রাস্তার একদম পাশেই। প্রতিটা ঝর্ণা দেখেছি হয় নিচ থেকে নাহয় পাশ থেকে। কিন্তু ডাইন্থেলেন ফলসটি উপভোগ করতে হয় একদম এর মাথায় দাঁড়িয়ে। উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ঝর্ণাধারা যেভাবে নিচের বিশাল পাথরখণ্ডে আছড়ে পড়ছিল তা দেখতে বেশ ভয়ই লাগছিল। ভয়ংকর সুন্দর শব্দটি এর জন্য একদম প্রযোজ্য। সেখান থেকে চলে গেলাম বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে নোয়াখালি ফলস নামে পরিচিত নোহাকালিকা ফলসে। সুউচ্চ পাহাড়ের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দূরের বিশাল ঝর্ণা আর এর আশপাশের নয়নাভিরাম প্রকৃতি দেখতে দেখতেই পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে দুপুরের খাবার পর্ব শেষ করলাম। আরও কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে রওনা দিলাম মাওসমাই কেভের উদ্দেশ্যে।

আদিম গুহার কতশত গল্প শুনেছি, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম হলো। মাওসমাই ক্যাভ চেরাপুঞ্জি বা স্থানীয় ভাষায় সোহ্‌রাতে অবস্থিত একটি প্রাচীন গুহা।

চেরাপুঞ্জি

পর্যটকদের জন্য গুহার ভিতরে নিকষ অন্ধকারকে কমাতে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা আছে। তাও কেমন গা ছমছমে একটি পরিবেশ। স্যাঁৎসেতে পাথরের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ছোটবেলায় দেখা মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড সিরিজের সেই গুহাটাকে মনে পড়েছে। সারাদিনের ভ্রমণ ক্লান্তি নিয়ে বিধ্বস্ত চেহারায় স্মৃতি রক্ষার্থে কিছু ছবি তুলে বের হয়ে এলাম চেরাপুঞ্জির অন্যতম আকর্ষণ সেভেন সিস্টার ফলসের উদ্দেশ্যে। স্থানীয়ভাবে এর নাম নশিংথিয়াং ফলস। প্রথম দিনের শুরুটা যেমন হতাশা দিয়ে শুরু করেছি দ্বিতীয় দিনটা শেষ করলাম হতাশা দিয়েই। ভারতের সবচেয়ে উঁচু ঝর্ণাটিকে পানিশূন্য দেখার হতাশা। তবে পাহাড় যাদের ভালো লাগে তাদের কাছে জায়গাটি অবশ্যই ভালো লাগবে। সেখান থেকে বের হয়ে দেমেকিট আমাদের থাকার জন্য হোম স্টে ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নেয়। ওই এলাকায় স্বল্প খরচে থাকার জন্যে অনেক হোম স্টে পাওয়া যায়। আমাদের তিনজনের রুমের খরচ পড়েছিল মাত্র ১৮০০ রুপি। রুমে ব্যাগপত্র রেখে তিনজন বেরিয়ে পড়লাম আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখতে।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের এলাকায় বৃষ্টির দেখা পেলাম সেদিন রাত দশটায়। সমতল থেকে প্রায় ৪৭০০ ফুট উচ্চতায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজার লোভ সামলাতে পারিনি, নেমে পড়ি রাস্তায়। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়কে পাশ কাটিয়ে কিছুটা সময় গায়ে বৃষ্টি মাখিয়ে রুমে আসি। সকালে মেঘের স্পর্শ নেয়ার উত্তেজনায় সারারাত ভাল ঘুম হয়নি, খুব ভোরে উঠে একাই বের হলাম মেঘ ছুঁতে। চোখের সামনে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাসতে ভাসতে এসে যেন আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে এতোদিনের দেখা সেই দূর আকাশের মেঘ। বেলা ১০টায় ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ৩০০০ রুপিতে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে শ্লোংপেডাং (সোনাংপেডাং) গ্রাম দেখে ডাউকি বন্দরে ফিরে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা দেই। সম্পূর্ণ ভ্রমণে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর যাত্রা ছিল এটি। চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে ভেসে বেড়ানো মেঘেদের কেটে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলছে ডাউকির পথে। মন ভরে সে মেঘ ও পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম পেছন পেছন যেন ভালো লাগার স্মৃতিগুলোও আমাদের অনুসরণ করছিলো। মনেমনে প্রতিটা সুন্দর স্মৃতিকে রোমন্থন করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম শ্লোংপেডাং (সোনাংপেডাং) গ্রামে। স্বচ্ছ নদীর গ্রাম এই শ্লোংপেডাং (সোনাংপেডাং), উমগট নদীর স্বচ্ছ জল দেখার জন্য এই গ্রামটি উৎকৃষ্ট। সেখানে নদীর উপর বিশাল এক ঝুলন্ত সেতু যা পর্যটকদের মন কেড়ে নেয়। ঝুলন্ত সেতুর উপর বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা ফিরে গেলাম ডাউকি স্থলবন্দরে। সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ৪ঠা মে বিকালে দেশের মাটিতে পা রাখলাম। শেষ করলাম সারাজীবন মনে রাখার মতো ও গল্প করার মতো সুন্দর একটি ভ্রমণ।

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ

জেলেপাড়ায় উঠানস্কুলের শিক্ষিকা রিংকু দাস
ডিঙিয়ে চলেছেন বাধার দেয়াল

তানজিনা আক্তার

রিংকু দাস। বাবা বজ্রহরি দাস, মা স্বর্গীয় ননীবালা দাস। ৫ ভাই ২ বোনের মধ্যে রিংকু সবার ছোট। সীতাকুণ্ডের গুলিয়াখালী জেলেপাড়ায় সিদীপের উঠান স্কুলের শিক্ষিকা। নিজেও এই জেলে পরিবারের সন্তান। অন্য কোনো ভাই-বোন লেখাপড়া করেনি। ছোটবেলা থেকেই মনের ভেতরে লালন করে আসছেন উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। কিন্তু তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে ঘিরে রেখেছিল আর্থ-সামাজিক বাধার দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল। জেলেপাড়ার ছেলেরা খুব অল্প বয়সেই বাপ-দাদার পেশায় জড়িয়ে যায়। তবে মেয়েরা কিছুকাল পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে– যদি নিজের ইচ্ছে এবং পরিবারের সম্মতি থাকে। কিন্তু তাদের পড়াশোনার চৌহদ্দি বড়জোর নবম/দশম শ্রেণি। লেখাপড়ার আকাঙ্ক্ষা যতোই থাকুক, নবম শ্রেণির চৌকাঠ পেরিয়ে দশম শ্রেণিতে উঠতেই তাদের বাধ্য হয়ে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে।

রিংকু দাস স্পর্ধার সঙ্গে গুলিয়াখালী জেলেপাড়ার অচলায়তন ভেঙেছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানো জেলে পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনাকে বিলাসিতা মনে করা হলেও রিংকুর শিক্ষাকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখা যায়নি। অদম্য ইচ্ছেশক্তির জোরে জেলেপাড়ার সবাইকে চমকে দিয়ে এসএসসি পাস করেছিলেন এবং এসএসসি পাস করার পর ভর্তি হয়েছিলেন কলেজে। কিন্তু একাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর মায়ের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। অন্ধকার নেমে এসেছিল পরিবারে। জগতের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার মা। পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তবে কলজে খামচে ধরা সেই শোক এক সময় তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য অর্জনে অনড় রিংকু পড়াশোনায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর পরেই পরিবার থেকে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বিয়ে করার জন্য। বলে দেয়া হয়েছিল– তারা আর তার পড়ার খরচ চালাতে পারবেন না। এবার সত্যিই দিশা হারিয়ে ফেলেছিলেন রিংকু।

ঠিক এমনই এক অসহায় অবস্থায় সিদীপের সীতাকুণ্ড শাখার শিক্ষাসুপারভাইজারের কাছ থেকে প্রস্তাব পান শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির (শিসক) একজন শিক্ষিকা হিসেবে জেলেপাড়ায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! পানিতে পড়ে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো প্রস্তাবটি লুফে নিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালের মার্চ মাসে শিসকের একজন শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়ে তাদের গুলিয়াখালী জেলেপাড়ায় চালু করেছেন একটি শিক্ষাকেন্দ্র। অল্পদিনেই তার শিক্ষাকেন্দ্র জেলেপাড়ার শিশুদের কলতানে মুখরিত হয়ে ওঠে। জেলেপাড়ার অভিভাবকদের মাসে ৫০০/৬০০ টাকা খরচ করে সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর সঙ্গতি নেই। সে ক্ষেত্রে রিংকু তার শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ থেকে ৫০ টাকার বিনিময়ে পড়ান বলে তারা তাদের সন্তানদের তার শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাতে থাকেন। শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠার পর বেশ কিছু টিউশনিও জুটে যায়।

শিক্ষিকা হিসেবে সিদীপ থেকে পাওয়া মাসিক সম্মানি, শিক্ষার্থীদের ফি এবং টিউশনি থেকে আয়ে এখন তিনি ভালোভাবেই তার পড়ার খরচ চালাতে পারছেন। এইচএসসি পাস করে স্নাতকে পড়ছেন। জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদেরও তিনি উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। এর বাইরে সিদীপ শিক্ষিকা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে তিনি সঞ্চয় করে চলেছেন। মনের নিভৃত আকাঙ্ক্ষা– সঞ্চয়ের এই টাকা তিনি বিয়ের গয়না কেনার জন্য খরচ করবেন।

নিজের অবস্থা তুলে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে রিংকু বলেন– 'সিদীপের মাধ্যমে মাত্র কলেজে পড়েই আমি গ্রামে শিক্ষিকা হিসেবে

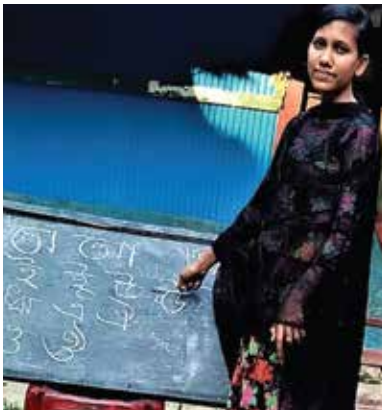

পরিচিতি পেয়েছি, যা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি আমার গ্রামের নিরক্ষর মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চাই। গ্রামের উন্নয়নে মেয়েদের এগিয়ে আনতে চাই। আমার মাধ্যমে সিদীপ হতে ঋণ নিয়ে গ্রামের অনেক যুবক আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। আশা করি, সিদীপ ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ করবে।'

লেখক: শিক্ষাসুপারভাইজার, সীতাকুণ্ড ব্রাঞ্চ

জীবনযুদ্ধে সফল এক কৃষক পরিবার

মো. ফয়সাল আহমেদ ও
প্রতাপ চন্দ্র রায়

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার বরকইট ইউনিয়নের পিহর গ্রামের বাসিন্দা মোসা. রহিমা বেগম, তার স্বামী মো. আলী আহমদ। পৈতৃকভাবেই পাওয়া জমিতে আলী আহমদ ও তার স্ত্রী রহিমা বেগম কৃষিকাজ করনে এবং কৃষিই তাদের একমাত্র আয়ের পথ। কিন্তু এই কৃষি থেকে তাদের যে পরিমাণ আয় হত তা দিয়ে অনেক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলত। তার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন; ১ মেয়ে, ২ ছেলে ও তারা ২ জন।

রহিমা বেগম ২০১৪ সালে নিমসার শাখা সিদীপের সদস্য হয়ে সাধারণ ঋণ গ্রহন করেন এবং ২০১৫ সালে সিদীপ থেকে কৃষিঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। প্রথম ধাপে তিনি ২০,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি ধানচাষ করেন। এই ধান চাষ করার ক্ষেত্রে সিদীপ নানাধরনের পরামর্শ প্রদান করে। তিনি ঐ সময়ে লোগো ও পার্চিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধান চাষ করেন । যার ফলে তার ধানের উৎপাদনও বেশ ভালো হয়। পরবর্তীতে ২য় ধাপে ৩০,০০০ টাকা ও তৃতীয় ধাপে ৪০,০০০ টাকা গ্রহণ করে থাকেন। এ টাকায় তিনি সিদীপ কর্মকর্তাদের পরামর্শে প্রায় ১.৫ বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ও ১ বিঘা জমিতে মরিচ চাষ করেন। এ কৃষিপণ্য উৎপাদনে সিদীপ থেকে তাকে প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও সহযোগিতা করা হয়। এই গ্রীষ্মকালীন টমেটো থেকে তিনি প্রায় ৮০,০০০ টাকা ও মরিচ থেকে ৫০,০০০ টাকা লাভ করেন।

পরবর্তীতে সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে চান্দিনা উপজেলা কৃষি কমকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং বর্তমানে তিনি কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তার সাথে কুমিল্লা হর্টিকালচার সেন্টার কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ হয় এবং এ সমস্ত মাধ্যম দিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কৃষি সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি সিদীপ থেকে আয়োজিত বিভিন্ন কৃষি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তিনি এখন এক পরিচিত মুখ ।

সিদীপের পরামর্শে ২০১৯ সালে তিনি বিরি ধান-৭৪ অর্থাৎ জিংকসমৃদ্ধ ধানের বীজ রোপণ করেন। পাশাপাশি তার এখন একটি মিশ্র ফলের বাগান রয়েছে যেখানে খাটো জাতের নারিকেল, আম, পেয়ারা, কলা ও আখ রয়েছে। পাশাপাশি কৃষক আলী

আহমদ কীটনাশক ব্যবহারের পরবর্তীতে বিভিন্ন জৈবসার ব্যবহার করে থাকেন যেমন ট্রাইকোকম্পোস্ট, সিদীপ থেকে দেয়া কেঁচোসার, গোবরসার ইত্যাদি। তার দেখাদেখি গ্রামের অন্যান্য কৃষক উৎসাহিত হচ্ছেন ।

২০১৯ সালে রহিমা বেগম সিদীপ থেকে ৫০,০০০ টাকা গাভীপালনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে তার ৩-৪টি গাভী রয়েছে। প্রতিবছর এখান থেকেও কৃষক আলী আহমদ বেশ ভালো টাকা উপার্জন করছেন। পাশাপাশি তার একটি মাছের ঘের রয়েছে, এখান থেকেও তিনি কিছু টাকা উপার্জন করতে পারছেন।

বর্তমানে তিনি শ্যালোমেশিন প্রকল্পে সিদীপ থেকে ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং এই মেশিন দিয়ে তিনি কৃষিতে সেচের কাজে ও মাছ চাষে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে নিমসার শাখার কর্মকর্তারা বুড়িচং উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে সেখান থেকে চমক হাইব্রিড জাতের ধান সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন। কৃষক আলী আহমদ তা লোগো পদ্ধতিতে ও পার্চিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোপণ করেছেন এবং এখান থেকে ভালো ফসল পাবেন বলে আশা করেছেন। সিদীপ নিমসার শাখা থেকে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরামর্শ দেয়া হয় এবং তিনি এসব পরামর্শ পেয়ে খুশি বলে আমাদেরকে জানান।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কৃষক আলী আহমদ বছরে প্রায় ৩,৫০,০০০ টাকা আয় করতে পারছেন। রহিমা বেগমের বড় ছেলে মো. ফয়সাল আহমেদ বেশ মেধাবী। শুধুমাত্র এ কৃষিকাজ থেকে আয়ের টাকা দিয়ে কৃষক আলী আহমদ তার বড় ছেলেকে চীনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাচ্ছেন। আলী আহমদ কৃষিকাজে যেমন সফল তেমনি ব্যক্তি জীবনেও তিনি একজন সফল পিতা।

লেখক: প্রতাপ চন্দ্র রায়, সিদীপের কৃষি কর্মকর্তা।
মো. ফয়সাল আহমেদ, সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কুমিল্লা জোন

মহিমান্বিত রাতে

মাহফুজ সালাম

বৃষ্টিধারার মতো অবিরাম ঝরে পড়ে গ্লানি
পূর্ণতার পথে নিঃশব্দে মোমের আর্তিটুকু
মহিমান্বিত রাতের নির্জনতায় ডেকে উঠে তার নাম
হুহু বাতাসের রব।

চোখের কোণে লোনাজলের ভাষা
বুকের মাঝে জমে থাকা ক্লেদ
বাতাস নিয়ে যায় তারে কৃষ্ণ গহ্বরে
সারারাত জপটপ
শরীর থেকে নামে জ্বরের প্রলাপ।

কপালের ঘাম আতরের ঘ্রাণ চুমু খায়
শরীর শরীরে মিশে মদির গন্ধ ছড়ায়
লোবানের আগুন শেষ হয়
হাসনাহেনার আনন্দ হিল্লোলে।

নগ্ন গায়ের মানুষ নগ্ন পা
তাই বলে সব পা এক নয়
রাতের আকাশ দু হাতের তালুতে নামে
আশার ফানুস বিশ্বাসের পাখা মেলে উড়ে চলে আরশের পথে
কাতারে কাতারে ভিড় জমে নীরব গ্লানি
দুঃখ হাসায় প্রাণ।

রাতের জমানো আবেগ
দিনের উর্বর জমিতে যে ফসল বুনেছিল কাল
আজ তা ফিকে হয়ে গেছে মাতাল মোহের টানে।

ভিতরে বিদ্বেষের ঢেউ তোলে অগণন
শূন্য কাতার, অগুণতি প্রাণ
প্রাণের আবেগ ধুলোয় মিশে।

অনুতাপ বুদ্‌বুদ্‌ বিশ্বাস
আস্তিনের আবর্জনা টোকা মেরে
ফেলে দিয়ে আবার হারিয়ে যায় লক্ষ প্রাণের অনুরণে
আকাশ হাসায় সকালের বিবর্ণ সুখ তারা।

তালের বিচিত্র খাবার

নাজমুন আমীন

তালের রসের পায়েশ

উপকরণ: আধা লিটার গরুর দুধ, আধা কাপ সাগু, এক কাপ গুড়া দুধ, এক কাপ তালের রস, আধা কাপ কুড়ানো নারকেল, এলাচ দুইটি, তেজপাতা দুইটি, দুই টুকরা দারুচিনি, ১০/১২ টা কিশমিশ, পরিমাণ মতো চিনি।

রান্নার প্রণালী: প্রথমে পরিমাণ মতো পানিতে আধা কাপ সাগু সেদ্ধ করে ঘন করে নিতে হবে। এরপর আধা লিটার গরুর দুধ চুলায়

অল্প আঁচে বসিয়ে একে একে সবগুলো উপকরণ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে এবং চুলার জ্বালটা একটু বাড়িয়ে নিব। এভাবে ২০-২৫ মিনিট নাড়তে নাড়তে ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ফেলতে হবে। উল্লেখ্য যে, চিনিটা একটু একটু করে দিয়ে চেখে দেখতে হবে। কেননা তালের রসের পায়েশে খুব বেশি চিনি দেয়া প্রয়োজন হয় না।

তালের রসের ক্ষীর

উপকরণ: এক লিটার গরুর দুধ, ৩/৪ কাপ গুড়া দুধ, ১/৪ কাপ আতপ চাল, আধা কাপ তালের রস, ১/৪ কাপ কাজু বাদাম, ১ টেবিল চামচ ঘি, ৮-১০ টা পেস্তাবাদাম, ১/৪ চামচ এলাচ গুড়া, আধা কাপ চিনি।

রান্নার প্রণালী: প্রথমে একটি হাঁড়িতে এক লিটার গরুর দুধ মাঝারি আঁচে চুলায় জ্বাল দিতে হবে। যখন দুধের উপর হালকা সরের মতো পড়বে তখন আগে থেকে ঘিয়ের মধ্যে ভেজে রাখা কাজুবাদামের টুকরাগুলো ঘিসহ দুধের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। অতঃপর গুড়া দুধ ঢেলে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে

নিতে হবে। এরপর একে একে ধুয়ে রাখা আতপ চাল, তালের রস, চিনি, এলাচ গুড়া দিয়ে দিতে হবে। এবার চুলার আঁচ একটু কমিয়ে দিয়ে ঘন না হয়ে আসা পর্যন্ত নাড়তে হবে এবং দেখে নিতে হবে চালটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। ক্ষীর ঘন হয়ে এলে একটি বড় বাটিতে ঢেলে তার উপর কুচি করে রাখা পেস্তাবাদাম ছিটিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

তালের রসবড়া

উপকরণ: খামিরের জন্য একটি মাঝারি আকারের তাল, এক কাপ তরল দুধ, আধা কাপ সুজি, ১ চামচ মৌরি গুড়া, ১ কাপ চালের গুড়া, আধা কাপ চিনি, শিরা তৈরির জন্য ১ কাপ পানি, এক কাপ চিনি, ২টি এলাচ ও পরিমাণ মত তেল।

বড়া তৈরির পদ্ধতি: মাঝারি আঁচে দুধটা জ্বাল দিয়ে বলক উঠানোর পর জ্বালটা সামান্য কমিয়ে দিতে হবে। অতঃপর দুধের মধ্যে ১.৫ কাপ তালের রস দিয়ে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে । এবার তার মধ্যে সুজি দিয়ে আবারও ভালভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তার মধ্যে মৌরি গুড়া ও চিনি দিয়ে অনবরত নেড়েচেড়ে খামির বানিয়ে নিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। খামির ঠান্ডা হতে হতে এক কাপ পানি ও চিনি দিয়ে শিরা তৈরি করে নিব। শিরা তৈরিতে অবশ্যই দুটো এলাচ মিশিয়ে নিব।

এবার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া তালের রসের খামির অল্প করে হাতের তালুতে নিয়ে ছোট ছোট বড়া তৈরি করে নিব এবং মাঝারি আঁচে হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেলে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চিনির সিরাটা একদম অল্প আঁচে খুব সামান্য গরম করে ভাজা বড়াগুলো দিয়ে ২ মিনিট নেড়েচেড়ে নিতেহবে। তারপর চুলা থেকে নামিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে পরিবেশন করতে হবে তালের নরম তুলতুলে রসবড়া ।

তালের ফুলকো পিঠা

উপকরণ: ১ কাপ চালের গুড়া, ২ টেবিলচামচ আটা, ২ টেবিলচামচ ময়দা, তালের রস আধা কাপ, চিনি আধা কাপ, ১ চা চামচ কালিজিরা, পরিমাণ মতো পানি, সামান্য বেকিং পাউডার এবং তেল।

পদ্ধতি: একটি মাঝারি আকারের পাত্রে চালের গুড়া, আটা, ময়দা, চিনি, আধা চা চামচ বেকিং পাউডার ও কালিজিরা দিয়ে এক সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর এতে তালের রস দিয়ে এবং একটু একটু করে পানি দিয়ে মাঝারি ঘনত্বের একটি ব্যাটার বানিয়ে নিতে হবে। এরপর সব উপকরণ মিশ্রিত ব্যাটারটি কমপক্ষে ২-৩ ঘন্টা ঢেকে রাখতে হবে। অতঃপর একটি গোলাকৃতির মাঝারি ডাব্বু বা ডালের চামচ দিয়ে ব্যাটার উঠিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দিতে হবে।

চুলার আঁচ মাঝারি রাখতে হবে এবং পিঠার এপিঠ-ওপিঠ উল্টিয়ে ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে।

তালহালুয়া

উপকরণ: ১ কাপ তালের রস, আধা কাপ গরুর দুধ, ৪ টেবিল চামচ গুড়া দুধ, ১টি এলাচ, ১টি তেজপাতা, ১ টুকরা দারুচিনি, ৪ টেবিল চামচ ঘি, ৬টি কাজুবাদাম (২ ভাগ করে) এবং ৮টি কিশমিশ।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে একটি মাঝারি আকারের তাল থেকে রস করে নিতে হবে। এরপর একটি বাটিতে এক কাপ তালের রস ও আধা কাপ গরুর দুধ একসাথে ফেটিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর গুড়া দুধ দিয়ে আবারও ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার একটি ননস্টিকি প্যানে ৩

টেবিলচামচ ঘি দিতে হবে। চুলার মাঝারি আঁচে ঘি গরম হয়ে এলে তাতে এলাচ, তেজপাতা, দারুচিনি, কাজুবাদাম, কিশমিশ দিয়ে ৩০ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে দুধ মেশানো তালের রস ঢেলে অনবরত নাড়তে হবে যেন প্যানের তলায় লেগে না যায়। এভাবে নাড়তে নাড়তে যখন হালুয়ার মতো টাইট হয়ে আসবে তখন বাকি ১ চামচ ঘি উপরে ছিটিয়ে ১ মিনিট নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।

লেখক: সিদীপের কর্মকর্তা (স্পেশাল প্রোগ্রাম)

সিদীপ ও কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানির মাঝে

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ১২ মার্চে যুক্তরাজ্যের কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে সিদীপ। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিদীপ এবং কে. এম. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (ইউ.কে.) সিদীপের কৃষি ও পশুসম্পদ খাতের সদস্যদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বীমা পলিসি তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে সিদীপের এই সদস্যগণ খুব অল্প খরচে তার সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন।

সিদীপ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সদস্যদের সম্পদ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে সিদীপ একদিকে যেমন কৃষি ও পশুসম্পদ খাতে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করছে তেমনি কোনো কারণে যদি সদস্যের প্রকল্প নষ্ট হয় বা প্রাণহানি ঘটে তাহলে তার পরিবার যাতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন ফসলের ওপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতা হ্রাস করছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অঞ্চলভেদে সেচের মাধ্যমে আবাদকৃত ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এই সমঝোতা স্মারক নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে
সেরা পাঠক-পাঠিকার মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও অলোচনা

শিশু-কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বাড়াতে, জ্ঞানচর্চায় তথা বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে ২রা জুলাই ২০২২এ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার যাত্রা শুরু করে। এখন পর্যন্ত সিদীপের উদ্যোগে ২২টি মুক্তপাঠাগার চালু করা হয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা কারো অনুমতি ছাড়াই নিজের পছন্দের বইটি নিতে পারে এবং পড়া শেষ হয়ে গেলে ফেরত দিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠচর্চা বাড়াতে ও তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এ সকল পাঠাগারের পাঠকদের মধ্য থেকে সেরা পাঠক/পাঠিকা নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেরা পাঠক/পাঠিকাকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বই পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্কুলে তিনজন করে সেরা পাঠক/পাঠিকা নির্বাচন করা হয় এবং তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'ইস্টিশন', বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং আশরাফ আহমেদের 'একাত্তরের হজমিওয়ালা' বইগুলো প্রদান করা হয়।

এ বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরে সিদীপের হাজীগঞ্জ শাখার আওতায় হাজীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলে, ৯ মার্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয়নপুর শাখার আওতায় রাবেয়া মান্নান উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১২ মার্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চারগাছ শাখার আওতায় এন আই ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, ১৫ মার্চে নাটোরে বনপাড়া শাখায় সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এণ্ড কলেজে, ১৬ মার্চে নাটোরে লালপুর-গোপালপুর শাখায় সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ মার্চে নাটোরে রাজাপুর শাখায় রাজাপুর ডিগ্রী কলেজে, ২১ মার্চে পাবনায় ভাঙ্গুরা শাখায় ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে, পাবনায় বালুচর শাখায় বোয়াইলমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে, রাজশাহীতে বাঘা শাখায় বাঘা আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ২২ মার্চে রাজশাহীতে পুঠিয়া শাখায় ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে, কুমিল্লায় রায়পুর (গৌরীপুর) শাখায় ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে ও পাবনায় দেবোত্তর শাখায় দেবোত্তর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। বেশিরভাগক্ষেত্রে আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সম্প্রতি ৪ জুন নারায়ণগঞ্জে সিদীপের আড়াইহাজার শাখায় রোকন উদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সফলভাবে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

নতুন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

কুমিল্লা জেলায় সিদীপের হায়দ্রাবাদ শাখার উদ্যোগে ২৮ মে তারিখে হায়দরাবাদ হাজী ইয়াকুব আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মো. আনোয়ারুল হকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। হায়দ্রাবাদ ব্রাঞ্চের বিএম মীর মো. আলাউদ্দিন, শিক্ষাসুপারভাইজার মাহমুদা আক্তার, অন্যান্য কর্মী ও সিদীপ শিক্ষিকাবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। সিদীপের প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম।

২৯ মে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্বোধন হলো পাবনায় সিদীপের সাঁথিয়া ব্রাঞ্চের আওতায় গৌরীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে। উদ্বোধন করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর। জনাব জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন স্থানীয় সমাজকর্মী আব্দুল লতিফ, সিদীপ সাঁথিয়া ব্রাঞ্চের বিএম মাহবুব হোসেন ও অন্যান্য। ঢাকা থেকে উপস্থিত ছিলেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন সিদীপের শিক্ষাসুপারভাইজার রোকসানা খাতুন, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তা দেবাশীষ রায় ও অন্যান্য।

৩০ মে পাবনায় সিদীপের কাশীনাথপুর শাখায় কাশীনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন প্রধানশিক্ষক জনাব ইসলাম উদ্দিন। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুব হোসেন। সিদীপের ঢাকা অফিস থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন সিদীপ কাশীনাথপুর ব্রাঞ্চের শিক্ষাসুপারভাইজার আসমা খাতুন ও অন্যান্য।

৬ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সিদীপের শিবগঞ্জ শাখার আওতায় দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্বোধন করা হয়। এসময় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব মো. গোলাম রাব্বানী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আলম হোসেন, শিবগঞ্জ শাখার শিক্ষাসুপারভাইজার কিসমত আরা ও প্রধান কার্যালয়ের প্রকাশনা ও গবেষণা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষালোক-এর পঞ্চম লেখক-শিল্পী সম্মিলন

সিদীপের সেমিনার ও সভাকক্ষে ১৮ মার্চ ২০২৩এ শিক্ষালোক-এর পঞ্চম লেখক-শিল্পী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেছেন, বাংলা ভাষা আন্দোলন আমাদেরকে দেশ দিয়েছে। কিন্তু এখনও ঔপনিবেশিক ভাষা বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে আরেকটি ভাষা আন্দোলন করতে হবে। তারা আরও বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও আমরা একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে খুবই কম বরাদ্দ দেয়া হয়। এটা খুবই হতাশাজনক। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

সভায় আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কুদরতে খোদা, সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া, সাম্প্রতিক দেশকাল সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, কবি সৈকত হাবিব, লেখক আরশাদ সিদ্দিকী, গবেষক সালেহা বেগম, জনবিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন প্রমুখ। সভার প্রথম পর্বে ভাষা, দ্বিতীয় পর্বে মুক্তপাঠাগার এবং তৃতীয় পর্বে নৈতিকতার ওপর আলোচনা করা হয়।

চলচ্চিত্র পরিচালক নোমান রবিন, সাংবাদিক রঞ্জন মল্লিক, সাংবাদিক অসীম সরকার, সমাজকর্মী ধ্রুব রহিম, সাংস্কৃতিক সংগঠক নাজনীন সাথীসহ আরও অনেক লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী নিয়ে শিক্ষালোকের দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত আলোচনায় সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

রোকেয়া ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পূরবী বসুর অনুসন্ধিৎসা

আশরাফ আহমেদ

পূরবী বসুর ‘রোকেয়া ও রবীন্দ্রনাথ কাছে থেকেও দূরে’ একটি চমৎকার চিন্তাজাগানিয়া গ্রন্থ। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার দুই মনীষী একই সময়ে জীবন অতিবাহিত এবং একই শহরে বাস করেও কেউ কখনো কারো সান্নিধ্যে আসেননি! দুজনের লেখাতেও একে অন্যের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল বলে জানা যায় না। প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে দুই মহিরুহই সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিক ও গুণীজনের সাথে সাক্ষাৎ, যোগাযোগ বা পত্রালাপ করেছেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের মাঝে নয়। বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী ও লেখক-গবেষক পূরবী বসু বইটিতে এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোকেয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয়, অহং এবং আভিজাত্যবোধ, সবকিছুরই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন।

নিশ্চিত করে কোনো উত্তর না মিললেও লেখক এ ব্যাপারে পাঠকদের অনুসন্ধিৎসাকে উস্কে দিতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম যেমন বিশাল, তাঁর জীবনী নিয়েও গবেষণা ও লেখা হয়েছে অজস্র। অন্যদিকে সমাজ পরিবর্তনের বিচারে রোকেয়ার অবদান রবীন্দ্রনাথ থেকে কম না হলেও তাঁর ওপর কোনো গবেষণা হয়নি বললেও চলে। পূরবী বসু লিখিত আকারে যৎসামান্য যা পেয়েছেন এবং বিভিন্ন জনের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যা উদ্ধার করতে পেরেছেন, সেই আলোকে লেখা বইটি আমার কাছে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে দুই মহিরুহই সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিক ও গুণীজনের সাথে সাক্ষাৎ, যোগাযোগ বা পত্রালাপ করেছেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের মাঝে নয়। বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী ও লেখক-গবেষক পূরবী বসু বইটিতে এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও রোকেয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয়, অহং এবং আভিজাত্যবোধ, সবকিছুরই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন

যোগাযোগ হলে দুজনই এবং দেশ ও জাতিও অধিকতর উপকৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকলেও কেন তাঁরা পরস্পরকে এড়িয়ে গেছেন তা সবসময়ই আমাদের প্রশ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বইটির লেখক এই দুজনের চারিত্রিক কিছু অপ্রশংসনীয় তথ্যও সমীচীনভাবেই তুলে ধরেছেন, যা সচরাচর আমাদের অগোচরেই রয়ে যায়। রোকেয়া এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধেয় হলেও অন্ধভক্তি এই আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

পূরবী বসুর অপরাপর লেখার মতোই বইটি সুখপাঠ্য। প্রবন্ধের বই সাধারণত একনাগাড়ে পড়ার ধৈর্য থাকে না। কিন্তু লেখার প্রসাদগুণে গবেষণামূলক আলোচ্য বইটি এর ব্যতিক্রম। বইটি পড়ে শুধু উপভোগই নয়, আমি ঋদ্ধও হয়েছি। ২০১৯ সালে ঢাকা থেকে ৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রকাশ করেছে ‘অন্যপ্রকাশ’।

৭ই মার্চ, ২০২৩

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী, রোকেয়াগবেষক, অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। বিজ্ঞানবিষয়ক রম্যগল্প, ভ্রমণ ও উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর বারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব এবং এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক

সিদীপের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন

৩ জুন ২০২৩এ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এবং এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ সিদীপের আশুলিয়া শাখার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় এমআরএ-র নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, এমআরএ-র পরিচালক মো. নূরে আলম মেহেদী এবং এমআরএ-র সিনিয়র সহকারি পরিচালক সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ উপস্থিত ছিলেন। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা তাদের প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখান এবং এগুলোর সার্বিক দিক তুলে ধরেন।

শাখা অফিসে তাঁরা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সম্মানিত অতিথিগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এরপর তাঁরা শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে স্থানীয় দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং অভিনব এই পাঠাগার চালুর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আড়াইহাজারে মুক্তপাঠাগারে পুরস্কার বিতরণ

সিদীপ আড়াইহাজার শাখায় রোকনউদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে শিক্ষার্থীদের হাতে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য মো. নজরুল ইসলাম বাবু'র সহধর্মিণী ডা. সায়মা আফরোজ ইভা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মৃদুল কান্তি পাল ও অন্যান্য শিক্ষক এবং সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান, বিএম ইউনুস আলী এবং শিক্ষা সুপারভাইজার হাছিনা নার্গিস উপস্থিত ছিলেন।

৫ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

প্রধান অতিথি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

স্থানীয় পাঠাগার সম্মেলন ২০২৩

● বিতর্ক প্রতিযোগিতা ● বই ও পাঠাগার বিষয়ক আলোচনা ● পাঠাগার উদ্যোক্তা সম্মাননা ● আবৃত্তি ও গান

কাশিনাথপুর, পাবনা । ১৭ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার